শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা.
এর সুদীর্ঘ ১১ বছরের সংশ্রবপ্রাপ্ত ও অত্যন্ত মহব্বতের পাত্র

আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা. বা.

এর এক অনবদ্য গুরুত্বপূর্ণ বয়ান

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড তবে কোন শিক্ষা?

সংকলক

হাফেয মুহা. মোরশেদ আল-হোসাইনী

ভূমিকা

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله الرَّحمن ، الذى علَّم القرآن ، وخلق الإنسان ، وعلَّمه البيان ، ودعا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والبرهان ، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّد سيِّد الأنبياء والمرسلين ، الذى أُوْتِيَ علمَ الأَوَّلِيْن والآخِرين ، وأرسلَه بالحقِّ بشيراً وَّنذيراً، وداعياً إلى الله تعالى بإذنه وسِراجاً مُّنيراً ، القائل: وإنَّ من البيان لَسِحْراً ، وعلى آله كنوزِ الهُدى ، وأصحابه بُدورِ الدُّجى ، ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم اللِّقاء . أمَّا بعد ...

আমার আরবী ৪র্থ শ্রেণী তথা 'নাহবেমীর' পড়ার বছর মুন্সিরহাট মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ওয়াজ শুরু হওয়ার পূর্বে আমার অত্যন্ত স্নেহপরবশ উস্তাদ হযরত মাওলানা আছেম বিল্লাহ সাহেব দা. বা. আমাকে ওয়াজ করার জন্য স্টেজে নিয়ে গিয়ে ওয়াজ করতে বলেন। হুযূরের আদেশ পালনার্থে আমি ওয়াজ আরম্ভ করি। এ সময় হযরত শায়খুল আরব ওয়াল আ'জম সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) এর বিশিষ্ট খলীফা (আমার নানা শ্বশুর) হযরত মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন (রহ.) মাদরাসার অফিস কক্ষে বসা ছিলেন। ওয়াজ শেষে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, এত ছোট মানুষ কেন ওয়াজ করলাম, তাই হয়ত তিনি আমাকে বকুনি দিবেন। আমার উস্তাদ হযরত আছেম সাহেব রহ.ও তাই ভাবছিলেন। এজন্য আমাকে না পাঠিয়ে

নিজেই সাথে করে নিয়ে আসলেন। আর বললেন, আব্বু![1] এর কোন দোষ নেই। তাকে আমিই বলেছি ওয়াজ করতে। তিনি বললেন, না, এজন্য ডাকিনি, ওর ওয়াজ শুনে আমি খুশি হয়েছি। অতঃপর আমাকে এ কথা বলে ওয়ায করার আদেশ দেন যে,

"ওয়ায করতে হবে, দেশে আলেম ওয়ায়েয নেই।"

ফলে ঐ বছর থেকেই বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে আমার দ্বীনী কথা-বার্তা আলোচনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়।

জামা'আতে মিশকাত পড়ার বছর হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক দা. বা.ও অধমকে ওয়ায করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।[2]

দাওরায়ে হাদীসের বছর হযরত মুফতী আ'যম বাংলাদেশ মুফতী মুহাম্মাদ ফয়যুল্লাহ (রহ.) এর সুযোগ্য খলীফা হযরত মাওলানা জামালুল ইসলামও (রহ.) বান্দাকে এ ধারা চালু রাখার আদেশ দেন।

১৯৯৫ ঈ. সনে করাচী থেকে দেশে ফিরার পর এ ধারাবাহিকতা ব্যাপক আকার ধারণ করলে বান্দা নিজ শায়খ ও মুর্শিদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.) এর কাছে বিস্তারিত লিখে জানালে তিনিও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার আদেশ দেন। এরই ফলশ্রুতিতে এ ধারা অদ্যাবধি চালু রয়েছে।

কয়েক বছর যাবত ওয়ায মাহফিল, তাফসীর মাহফিল ও জুমআর বয়ানগুলো অনেকেই ক্যাসেটে ধারণ করছে। এর মধ্য থেকে "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, তবে কোন শিক্ষা?" বয়ানটি অধমের স্নেহাস্পদ হাফেয মৌলভী মুহা. মোরশেদ (সাল্লামাহু) ক্যাসেট থেকে সংকলন করেছে। আল্লাহ পাক তাকে তার দাদাজান হযরত মাও. দিলাওয়ার হোসাইন রহ. এর মত একজন বুযুর্গ আলেমে দ্বীন হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

---

[1] তিনি হযরত মাও. দিলাওয়ার হোসাইন রহ. এর বড় সাহেবজাদা।

[2] এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "জীবন ও কর্মের" ৮৪ পৃষ্ঠায় ওয়াজ-নসীহত শিরোনাম দেখুন।

বইটি আমার নিয়মিত কোন রচনা নয় বরং একটি বয়ান। তবে অধম লিখাগুলোকে পুনরায় দেখে কিছু সংযোজন-বিয়োজন অবশ্যই করেছে।

রচনা ও বয়ান এক ধাঁচের হয় না। লিখনিতে সাধারণত শিক্ষিতদেরকে সামনে রাখা হয় আর বয়ান হয় সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের সামনে। তথাপি আমার ব্যক্তিগত অভ্যাসঃ "আমার কথা সুন্দর ও উচ্চমানের হোক" কখনো এদিকে খেয়াল রাখি না। বরং "দলীল ভিত্তিক, যুক্তিসংগত ও সহজ হোক"'সে দিকেই বেশী খেয়াল রাখি। যাতে সর্ব শ্রেণীর শ্রোতাদের বুঝতে সহজ হয় এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন কথা কারো দৃষ্টিতে আপত্তিকরও হতে পারে। আল্লাহ পাক ক্ষমা করুন! "খোঁচা দিয়ে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই, এমনটি আমি পছন্দও করি না।" তথাপি "الحقُّ مرٌّ" (হক তিক্ত হয়) এ হিসেবে কোন কোন কথা কারো গায়ে লাগতে পারে। আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

তৃতীয়তঃ আমি সাধারণত নিজের পক্ষ থেকে কিছু না বলে আকাবির ও বুযুর্গানে দ্বীনের কথাই উদ্ধৃতি সহকারে পেশ করার চেষ্টা করি। ছোটবেলা থেকে আব্বাজান (রহ.) এর কাছে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর ওয়াযের সংকলন "আল ইবক্বা" এর কথা শুনে আসছিলাম। আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া তিনি আমার 'জামা'আতে শরহে জামী' পড়ার বছর ২২ বছরের বাইশ খন্ড 'আল ইবকা' আমার হাতে এনে দেন। তখন থেকেই এগুলো পড়া আরম্ভ করি এবং সবগুলো পড়ে শেষ করি –ولله الحمد والشكر–। আমার অধিকাংশ কথাই আল ইবক্বা কিতাবের। তারপরও এর মধ্যে যত ভুল-ভ্রান্তি আছে সবই আমার। আর এতে যদি কোন হেদায়েত নিহিত থাকে সবই আকাবির ও বুযুর্গদের।

চতুর্থতঃ আমি কোন ওয়ায়েয নই। আমি একজন নগণ্য তালিবে ইল্‌ম। তাই আমার কথাগুলো তালিবে ইল্‌ম হিসেবেই হবে। এগুলোকে বুযুর্গানে দ্বীনের মহা মূল্যবান বয়ানের সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না।

পঞ্চমতঃ আমি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে লেখা-পড়া করার দরুণ বাংলা সাহিত্যে অনেক দূর্বল। তাই কিতাবটির মধ্যেও সাহিত্য কলা-কৌশল পাওয়া যাবে না।

الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا

غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے

“বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শব্দের পেঁচে ঘুর পাক খান না;
ডুবুরিদের উদ্দেশ্য তো মুক্তা, ঝিনুক নয়।”

তদ্রুপ এখানেও উদ্দেশ্য হেদায়েতের নিয়াতে মূল বিষয়বস্তুটি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা, ভাষার পাণ্ডিত্য দেখানো নয়। তার অর্থ আবার এটাও নয় যে, ভাষার কোন গুরুত্বই নেই। বরং ভাষার গুরুত্ব অনেক বেশী। তবে আমি এ বিষয়ে দূর্বল তাই বলছি।

ষষ্ঠতঃ আয়াত ও হাদীসগুলো হাওয়ালা, কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা সহকারে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ছাত্র জনাব মুফতী মা’সূম বিল্লাহ খুলনাভী (মুহাদ্দিস ও মুফতী, জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা)। এর দ্বারা আশা করি কিতাবটির উপকারিতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আল্লাহ পাক তার ইলম ও আমলে আরও বরকত দান করুন। আমীন!

পরিশেষে কিতাবটির পিছনে যাদের সামান্যতম শ্রমও রয়েছে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাক কিতাবটিকে সকলের জন্য হেদায়েত ও নাজাতের অসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

দিলাওয়ার হোসাইন
জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

তাং ১৩/৬/১৪৩০ হি.

সংকলকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অমিয় বাণী কুরআনে কারীমের মত মহান দৌলতের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তিনি আমাদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের উপর অটল রেখেছেন এবং কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করার মতো সৌভাগ্যময় ও মহামূল্যবান কাজে নিয়োজিত রেখেছেন।

আমরা দাবি করছি যে, আমরা কুরআন ও হাদীসের ধারক-বাহক! কিন্তু আজ আমরা আমাদের মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে দিগ-বিদিক ছোটাছুটি করছি! অথচ আমাদের মর্যাদার কথা শুনে ফেরেশতাগণ আফসোস করেছেন! যখন একটি ছেলে মাদরাসায় ভর্তি হয় তখন তাকে বলা হয় তালিবুল ইলম, এরপর মুনশী, এরপর মৌলভী, এরপর মাওলানা, এরপর মোল্লা, এরপর হযরত কিংবা হুযূর। কিন্তু কী অর্থ এই শব্দগুলোর? এগুলোর মাধ্যমে আমাদের মর্যাদার কথা ফুটে উঠে। আর তা আমি শুনেছি আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা. বা. এর যবান থেকে। আমি বহুদিন ধরেই হযরতের সোহবতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করছি। আমি দেখেছি তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান বয়ান ও বক্তব্য হাজার হাজার তালিবুল ইলমকে তাদের জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। ফলে তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছে, ধন্য করেছে তাদের জীবন।

হযরতের এ মূল্যবান কথাগুলো সারা দেশে দ্বীনী শিক্ষার্থীদের জানানোর আগ্রহ আমার মনকে দোলা দিতে থাকে। তাই হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের অনুমতি ও দু'আ নিয়ে আমার ধর্মীয় জ্ঞানের দীনতা, ভাষাজ্ঞানের স্বল্পতা এবং লেখনী শক্তির দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও হযরতের কিছু মূল্যবান বয়ান ও বক্তৃতা সংকলন করার সাহস করেছি।

আমার সংকলনটি ত্রুটিমুক্ত হয়েছে, এমন দাবি করার মতো দুঃসাহস আমার নেই। তাই কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, প্রকাশককে অবহিত করতে অনুরোধ করার সুনিয়ত আমার আছে। সংকলনের কাজে

আমাকে যারা অনুপ্রাণিত করেছেন তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের মধ্যে মুফতী মা'সূম বিল্লাহ, যুবায়ের আল মাহমুদ ও আবূ বকর বিন হেদায়েতুল ইসলাম এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা বিভিন্ন সময় এ কাজে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

পরিশেষে পাঠকবৃন্দ গ্রন্থখানি পড়ে উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ তা'আলা অধম এবং তার এ খেদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!

বিনীত

তাং ২৫/০৭/২০০৯ ঈ.

মুহা. মোরশেদ আল হোসাইনী

উৎসর্গ

আমার জনম-সারথী মাকে
যার স্নেহ-ছায়ায় জীবনের এতটা পথ হেঁটেছি
যিনি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে বুকের মমতা দিয়ে
আমাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন
যে অস্তিত্বের উপমা অশ্রুর বিনিময়েও পাওয়া যায় না
আল্লাহ তাঁর দেহ হৃদয়কে প্রশান্ত রাখুন
তাঁর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ও সুন্দর রাখুন।

এ প্রত্যাশায়..........

সংকলক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

ঙ ঌ

খুতবা

نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونُؤمن به ونتوكَّل عليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا ، ومِن سيِّئاتِ أعمالِنا ، مَن يَّهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ، ومَن يُّضْلِلْه فلا هادىَ له ، ونَشهد أن لآ إلٰه إلاَّ الله وحدَه لا شريكَ له ، ولا فريقَ له ولا وزيرَ له ولا نظيرَ له ولا مُشِيرَ له ولا مُعِينَ له ، ولا شِبْهَ له ولا شَبِيْهَ له ولا مَثِيلَ له ولا مثالَ له ولا مِثْلَ له ولا أصلَ له ولا نسلَ له ولا كفؤَ له ، ولا قبلَ له ولا بعدَ له ، ولا وقتَ له ولا زمانَ له ، ولا أوّلَ له ولا آخِرَ له ، ولا بدايةَ له ولا نهايةَ له ، ولا ضِدَّ له ولا نِدَّ له ولا حَدَّ له ، ونشهد أنَّ سيِّدَنا ونبيَّنا ، وحبيبَنا وحبيبَ ربِّنا ، وطبيبَنا وطبيبَ قلوبِنا ، ومولانا محمَّداً عبدُه ورسولُه ، أرسله بالحقِّ بشيراً وَّنذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه و سِراجاً مُّنيراً ، صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ، وسلَّم تسليماً كثيراً كثيراً . أمَّا بعد:

فأعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم ، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ،

قُلْ هَلْ يَسْتَوِيْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ[3] .

---

[3] [illegible] : [illegible]

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

طلب العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم[4]. أوكما قال عليه الصَّلاة والسَّلام .

اللّهمَّ صلِّ على سيِّدِنا محمَّدٍ ، وَّعلى آلِ سيِّدِنا محمَّدٍ ، كما صلَّيتَ على سيِّدِنا إبراهيمَ ، وعلى آلِ سيِّدِنا إبراهيمَ ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ . اللّهمَّ بارِكْ على سيِّدِنا محمَّدٍ ، وَّعلى آلِ سيِّدِنا محمَّدٍ ، كما بارَكتَ على سيِّدِنا إبراهيمَ ، وعلى آلِ سيِّدِنا إبراهيمَ ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ .

বাংলাদেশের উলামা প্রসিদ্ধ জেলা নোয়াখালী। এ জেলার প্রাণকেন্দ্র "চৌমুহনী মদনমোহন হাই স্কুল" মাঠের বিশাল সমাবেশে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত বুঝা যাচ্ছে বিধায় শিক্ষা সম্পর্কিত একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি এবং একটি হাদীস পাঠ করেছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

"হে নবী! বলুনতো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"[5] মোটেও নয়, যারা শিক্ষিত আর যারা শিক্ষিত নয় (তথা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত) দুই সম্প্রদায় কখনো এক সমান হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমানঃ

---

[4] رواه ابن ماجه في سننه ، عن أنس ، باب فضل العلماء والحثّ على طلب العلم ، ص: ٢٠، والبيهقيّ فى شُّعَب الإيمان ، رقم: ١٦٦٣-١٦٦٦ ، و أبو يعلى الموصلي في مسنده ، رقم الحديث : ٢٨٧٤ ، بإسناد متصل و رجاله ثقات ، وقال الحافظ ابن حجر فى اللآلي: وهو حسن ، وقال المِزِّيّ: رُوِى من طُرُقٍ تبلغ رتبةَ الحسن ، وأخرجه ابن الجَوزيّ في منهاج القاصدين من جهة أبى بكر بن داود وقال: ليس فى حديث طلب العلم فريضة أصحّ من هذا. انتهى. كذا نقله العَجْلُونيّ في كشف الخَفاء ، ٤٤/٢، وقال الشَّيخ محمَّد عَوَّامة فى التَّعليق على المصنَّف لابن أبي شيبة: فقد أطبق علماء السَّلَف على تضعيف حديث "طلب العلم فريضة" وصحَّحه الخَلَف، ٣٢٤/١، وراجع للتَّفصيل: المقاصد الحسنة للسَّخاوي، ص: ٤٤٠-٤٤٢، وكشف الخَفاء للعَجْلُوْنيّ، ٤٣/٢-٤٥. (معصوم بالله .)

[5] সূরা যুমার ৩৯:৯

"ইলম তথা জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।"[6] (চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী)।

কেউ আবার كل مسلم এর সাথে ومسلمة শব্দ বৃদ্ধি করেন। মুসলিমা শব্দ বৃদ্ধি করা সঠিক নয়। কারণ হাদীসে এ শব্দটি নেই, হাদীসে শুধু "মুসলিম" পর্যন্তই এসেছে।[7] তাই বলে আবার কেউ এ কথা ভাববেন না যে, তাহলে নারীদের জন্য ইলম তথা জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয নয়। ইলম তথা জ্ঞান অন্বেষণ করা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই ফরয। কেননা 'মুসলিম' বলতে শুধু পুরুষকে বুঝায় না বরং নারীকেও বুঝায়। যেমন, "اَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ" এর মধ্যে শুধু পুরুষকেই নামায কায়েম করার কথা বলা হয়নি বরং নারীদেরকেও বলা হয়েছে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড

আপনারা বিভিন্ন বই-পুস্তকে দেখেছেনঃ "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড"। কথাটি একেবারেই সত্য। আমাদের মেরুদণ্ড না থাকলে আমরা দাঁড়াতে পারতাম না। তেমনিভাবে শিক্ষা না থাকলে জাতি দাঁড়াতে পারে না। অশিক্ষিত জাতি মেরুদণ্ডহীন, আর শিক্ষিত জাতি মেরুদণ্ডওয়ালা। শিক্ষার অসীলায় জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকে। শিক্ষা না থাকলে জাতির অস্তিত্ব আস্তে আস্তে মিটে যায়। শিক্ষা এমন এক মহামূল্যবান সম্পদ যার কোন তুলনা নেই। তাইতো হযরত আলী মুরতাযা রাযি. [হি.পূর্ব: ২৩-৪০ হি.] এ কথা বলে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করেছেনঃ

---

[6] সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ২০, শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী, হাদীস নং ১৬৬৩-১৬৬৬, আল মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ৪৪০-৪৪২, কাশফুল খাফা, ২/৪৩-৪৫ (মা'সূম বিল্লাহ)

[7] قال السَّخاويّ فى المقاصد الحسنة (ص: ٤٤٢) : قد ألحق بعض المصنِّفين بآخر هـذا الحـديث "ومسلمة"، وليس لها ذكر في شيئ من طُرُقه وإن كان معناها صحيحاً .(معصوم بالله.)
আল মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ৪৪২

رضينا قسمةَ الجبَّارِ فينا
لنا علمٌ وَّلِلْأَعداءِ مال

আল্লাহ পাকের বণ্টনের উপর আমরা সন্তুষ্ট
(তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি)
তিনি আমাদের ভাগে রেখেছেন বিদ্যা
আর দুশমনের ভাগে রেখেছেন সম্পদ ।

উক্ত বণ্টনের উপর এত সন্তুষ্ট ও খুশি হওয়ার কারণ কী? এর কারণ হযরত আলী মুরতাযা রাযি. নিজেই বর্ণনা করেছেন যে,

فإِنَّ المالَ يَفني عن قريب
وإِنَّ العلمَ باقٍ لايَزال

কেননা অদূর ভবিষ্যতে সম্পদ শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে,
পক্ষান্তরে, বিদ্যা সবসময় বিদ্যমান থাকবে, দূর হবে না ।

বরং এ বিদ্যা এক সময় বিদ্বানকে "দারুল ক্বারার" তথা বেহেশতে পৌঁছিয়ে দিবে । হ্যাঁ, নিজে বিদায় দিয়ে দিলে চলে যাবে তা ভিন্ন কথা । শেখ সা'দী রহ. [৫৮০ হি./১১৮৪ ঈ.-৬৯১হি./১২৯২ ঈ.] বলেনঃ

برو دامن علم گیر استوار
کہ علمت رساند بدار القرار

বিদ্যা খুব বেশি অর্জন কর, কেননা এ বিদ্যা
তোমাকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দিবে ।

এখান থেকে বুঝা গেল ইলম কেমন অমূল্য সম্পদ !!

যে কোন কিছু জানা ও বুঝার নাম শিক্ষা নয়

কিন্তু বুঝার বিষয়, ইলম তথা শিক্ষা বলতে কী বুঝায়? শিক্ষা কাকে বলে? আমরা সাধারণত এমন মনে করে থাকি যে, যে কোন কিছু জানা

এবং বুঝার নামই শিক্ষা। যে ব্যক্তি কোন একটা কিছু জানে এবং বুঝে সেই শিক্ষিত। কিন্তু বাস্তবতা এর স্বপক্ষে নয়, সব কিছু জানার নাম আর সব কিছু বুঝার নাম শিক্ষা নয়। যদি তাই হয় তাহলে চোর চুরির পূর্বে জেনে নেয়, কিভাবে চুরি করলে সে ধরা পড়বে না। সন্ত্রাসী সন্ত্রাসের আগে ট্রেনিং নিয়ে নেয়, কিভাবে সন্ত্রাস করলে সে এ্যারেস্ট হবে না। ডাকাত ডাকাতির পূর্বে জেনে নেয় কিভাবে ডাকাতি করলে সে খুন হবে না, অন্যকে খুন করে মাল লুণ্ঠন করতে পারবে।

এগুলো জানা কি জাতির মেরুদণ্ড? না, বরং জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেয়? বুঝা গেল সবকিছু জানার নাম শিক্ষা নয়।

শিক্ষা কিসের নাম? শিক্ষা ঐ জানা এবং বুঝার নাম যা একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট, অন্য কোন জীবজন্তুর বৈশিষ্ট নয়।

সব কিছু জানার নাম আর সব কিছু বুঝার নাম যদি শিক্ষা হতো তাহলে বলতে হবেঃ

মুরগী আমাদের চেয়ে আরো বড় শিক্ষিত!
মধুপোকা আমাদের চেয়ে আরো বড় শিক্ষিত!
বাবুই পাখি আমাদের চেয়ে আরো বড় শিক্ষিত!
ইঁদুর আমাদের চেয়ে আরো বড় শিক্ষিত!
উইপোকা আমাদের চেয়ে আরো বড় শিক্ষিত!

প্রশ্ন হতে পারে তা আবার কিভাবে?

মুরগীর আশ্চর্য কর্ম

দেখুন, মুরগী যখন বাচ্চা ফুটানোর সময় ডিমে তাও দেয়, আপনি তখন ঐ ডিমগুলোর উপর কলম দিয়ে এক-দুই-তিন লিখে সিরিয়াল অনুযায়ী ডিমগুলো মুরগীর নীচে রাখুন। এরপর আগামীকাল এসে ডিমগুলোকে দেখুন! দেখবেন যে, আপনার সিরিয়াল ঠিক থাকেনি। সিরিয়াল উলট-পালট হয়ে গেছে, কে করল এই উলট-পালট? মুরগী নিজেই করল। কেন করল? মুরগী এ কথা ভাল করেই বুঝে যে, আমার দেহের তাপের কারণে ডিমে বাচ্চা আসে। যে ডিমগুলো আমার বুকের

নীচে আছে এগুলোর মধ্যে তাপ বেশি লাগছে, আর যেগুলো আমার পাশে আছে সেগুলোতে তাপ কম লাগছে। যদি মালিকের সিরিয়াল ঠিক রাখতে যাই তাহলে আমার বুকের নীচের ডিমগুলোতে বাচ্চা আগে আসবে, যেহেতু তাপ বেশি লাগছে, আর পাশের ডিমগুলোতে হয়ত বাচ্চা পরে আসবে অথবা আসবে না, পঁচে যাবে। যেহেতু এগুলোতে তাপ কম লাগছে। পঁচে গেলে তো অনেক ক্ষতি, আর পরে আসলে মুরগীর জন্য মহা সমস্যা।

কেননা যদি এভাবে আগ-পাছ করে বাচ্চা আসে তাহলে যে ডিমগুলোর বাচ্চা আগে চলে আসল বাচ্চাগুলোর দাবি হবে, আমাদের 'মুরগী মা' আমাদেরকে নিয়ে বাইরে ঘুরুক ও আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করুক। আর যে ডিমগুলোতে বাচ্চা আসেনি সেগুলোর দাবী হবে, মুরগী আমাদেরকে বুকের নিচে নিয়ে বসে বসে তাও দিতে থাকুক। এখন মুরগী কেমন সমস্যায় পড়বে, বাচ্চা নিয়ে ঘুরবে? না, যে ডিমগুলোর মধ্যে এখনো বাচ্চা আসেনি ঐগুলোকে তাও দিবে? বাচ্চা নিয়ে ঘুরলে তাওবিহীন অবস্থায় এ ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাও দিতে গেলে বাকী বাচ্চাগুলো কাক-চিলের পেটে যাবে। ফলে মহা সমস্যায় পড়বে মুরগী। অতএব উক্ত সমস্যা দূর করার জন্য মুরগী বেচারি বুকের নীচের ডিমগুলোকে পাশে নেয় আর পাশের ডিমগুলোকে বুকের নীচে আনে, এভাবে উলট-পালট করতে থাকে। কোন্ ডিমে কী পরিমাণ তাপ লেগেছে সে তা বুঝে। ঐ হিসেবেই উলট-পালট করে।

অথচ আমাদের দেহের তাপমাত্রা বুঝার জন্য আমরা থার্মোমিটার ব্যবহার করে থাকি। এমনিতে বুঝা যায় না যে, তাপমাত্রা এখন কত ডিগ্রি। থার্মোমিটার ব্যবহার করার পর বুঝি। কিন্তু মুরগী কি করে বুঝল কোন ডিমে কি পরিমাণ তাপ রয়েছে? তার থার্মোমিটারের কোন প্রয়োজন পড়েনি, বিনা থার্মোমিটারেই সে বুঝে এ ডিমে তাপ এই পরিমাণ হতে পারে আর ঐ ডিমে ঐ পরিমাণ। ডিমগুলোকে উলট-পালট তথা স্থানান্তর করতে হবে।

এবার বিবেচনা করুন! এ বিষয়ে আমরা বেশি বুঝি? নাকি মুরগী বেশি বুঝে? এত বুঝার পরও মুরগীকে কেউ কোন দিন শিক্ষিত বলতে শুনেছেন? কেন বলে না? তাকে শিক্ষিত বলতে বাধা কোথায়? বুঝা গেল এগুলো জানা ও বুঝার নাম শিক্ষা নয়। কেননা এগুলো বুঝা মানুষের বৈশিষ্ট নয়।

মুরগীর বাচ্চা সিজারের মাধ্যমে বের হয়

আমাদের সন্তান মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার জন্য কুদরতী একটি রাস্তা আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ রাস্তা দিয়ে সন্তান বের হয়ে আসে, মাঝে মধ্যে সমস্যাও দেখা দেয়, তখন আমরা ডাক্তারের শরনাপন্ন হই। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, প্রয়োজনবোধে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা বের করে নিয়ে আসে। কিন্তু মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার তো কোন রাস্তা নেই, এর মানে মুরগীর প্রত্যেকটি বাচ্চা সিজারের মাধ্যমেই বের করতে হয়। কে করে সিজার? সে তো এ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালেও যায় না, আমাদের ন্যায় ডাক্তারের শরনাপন্নও হয় না, সে নিজেই নিজের ডিম সিজার করে বাচ্চা বের করে।

আমাদের ডাক্তাররাতো সিজারের দক্ষতা অর্জন করতে প্রাইমারি স্কুল থেকে নিয়ে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত অন্তত বিশ বছর লেখাপড়া করেছে, মুরগী কি বিশ ঘণ্টাও লেখাপড়া করেছিলো? সে সিজার করা বুঝলো কিভাবে? তারপরও কেউ মুরগীকে শিক্ষিত বলে না। কারণ এগুলো বুঝা শিক্ষা নয়, যেহেতু এগুলো মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

মুরগীর বাচ্চার আল্ট্রাসনোগ্রাফী

সিজার করতে গিয়ে মুরগী একসাথে ডিমের সব খোসা ফেলে দেয় না, বরং যে জায়গা দিয়ে তার শ্বাস-নিঃশ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন শুধু ঐ জায়গা দিয়ে একটি ছিদ্র করে। দেখবেন, প্রাথমিক অবস্থায় কোন ডিমে দু'টি ছিদ্র নেই, ছিদ্র একটি, তাও যেখানে সেখানে নয়, বরং বাচ্চার নাক

কোন্ জায়গায় আছে, শ্বাস-নিঃশ্বাস কোন্ জায়গা দিয়ে নিতে হবে, আর কোন্ জায়গা দিয়ে ছাড়তে হবে, ঠিক ঐ জায়গা দিয়েই ছিদ্র করবে। অথচ আমাদের পেটের ভিতরের বাচ্চা কি অবস্থায় আছে, পূর্ণাঙ্গ না অর্ধাঙ্গ, ছেলে না মেয়ে, এগুলো বুঝার জন্য এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফীসহ আরও কত কিছু করা লাগে। তারপর বুঝতে পারি, কিন্তু এরপরও বুঝের ভুল হয়। ডাক্তার বলেছেঃ ছেলে হবে। দেখা গেছে মেয়ে হয়েছে। ডাক্তার বলেছেঃ মেয়ে হবে। দেখা গেছে ছেলে হয়েছে। আমাদের ভুল হয়, কিন্তু মুরগীর কোন এক্স-রের প্রয়োজন পড়লনা, আল্ট্রাসনোগ্রাফীর প্রয়োজন পড়ল না, সে বুঝে, ডিমের খোসার ভিতরে বাচ্চার ঠোঁট কোন জায়গায় আছে, ঐ জায়গা দিয়ে সে ছিদ্র করে দেয়, যাতে তার শ্বাস-নিঃশ্বাস নিতে সুবিধা হয়। তার ভুল হয় না।

এবার বলুন, আমরা বড় শিক্ষিত? নাকি মুরগী বড় শিক্ষিত? আমরা তো মেশিন দিয়ে বুঝতে গিয়েও ভুল করি। মুরগী বিনা মেশিনে বুঝল, তার কোন দিন ভুল হলো না, সে ঠিক জায়গায় ছিদ্র করল। এতকিছু জানার পরও কেউ মুরগীকে শিক্ষিত বলবেন? না কাউকে বলতে শুনেছেন? কেন শুনলেন না? মুরগীকে শিক্ষিত বলতে বাধা কোথায়? বুঝা গেল এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়, কারণ এগুলো মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

বাবুই পাখির ঘরের দুয়ারে বাতি

রাতের অন্ধকারে বাবুই পাখির বাসার দুয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখবেন, টিম টিম করে আলো জ্বলছে। আমরা আলোর জন্য বাতি ব্যবহার করি, বাতি জ্বলতে হলে তেল লাগে, কিংবা কারেন্ট ব্যবহার করে থাকি, এতে খুঁটি লাগে, তার লাগে, বাল্ব ও টিউব ইত্যাদি কত কিছু লাগে, এরপরও মাঝে মধ্যে তেল শেষ হয়ে বাতি নিভে যায়, কারেন্টের খুঁটি উপড়ে পড়ে, তার ছিড়ে যায় ফলে অন্তত লোডশেডিং তো হয়ই। কিন্তু বাবুই পাখি তার বাসার দুয়ারে বাতির ব্যবস্থা করে কিভাবে? দিনের বেলায় জোনাকি পোকার মাথা টিপে টিপে বাসার সামনে স্তুপ করে রাখে,

রাতে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আলো বের হতে থাকে, যতই অন্ধকার বাড়বে, ততই আলো বাড়বে। তেল শেষ হওয়ার চিন্তা নেই, খুঁটি উপড়ে পড়ার ভয় নেই, তার ছিড়ার আশংকা নেই, লোডশেডিং এর চিন্তাতো নেইই।

এতকিছু জানার পরও কি কেউ বাবুই পাখিকে শিক্ষিত বলে? কেন বলে না? কারণ এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়, এগুলো মানুষের বৈশিষ্ট নয়। যদি এগুলো জানার নাম শিক্ষা হত তাহলে বলতে হবে বাবুই পাখি শিক্ষিত। কিন্তু কেউ বাবুইকে শিক্ষিত বলে না। বুঝা গেল এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়।

বাবুই পাখির ঘর-বাড়ী

বাবুই পাখি তালগাছের পাতার আগায় তার ঘর-বাড়ী ঝুলিয়ে রাখে। আপনি তালপাতার আগায় রশি দিয়ে বেঁধে কোন বস্তু ঝুলিয়ে রেখে দেখুন না! থাকবে? না, নিশ্চিত পড়ে যাবে। কিন্তু বাবুই পাখি তার ঘর-বাড়ী ঝুলিয়ে রাখল, বাতাসে কত পিটছে, ডাল ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাসা এমনভাবে সে আটকিয়ে রেখেছে যে, পড়ছে না।

কোন জায়গা দিয়ে ঘরে ঢুকবে, কোথায় তারা থাকবে, কোথায় বাচ্চা থাকবে, সব ঠিক-ঠাক বানিয়ে রেখেছে। ব্যবহার করেছে শুধু তালপাতা, অন্য কোন উপাদান নেই। আর আমরা বিল্ডিং বানাই ইট-বালি-রড-সিমেন্ট আরো কত ধরনের পাথর ইত্যাদি দিয়ে। আর সে বাড়ী বানায় শুধু পাতা দিয়ে, কত মজবুত করে বানায়। ডাল পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে যায়, কিন্তু বাবুই পাখির বাসাটি ছিঁড়ে পড়ে না।

এতো কিছুর পরও বাবুই পাখিকে কেউ শিক্ষিত বলে? বলে না, কেন বলে না? বুঝা গেল এগুলো জানার ও বুঝার নাম শিক্ষা নয়।

মৌমাছির বস্তা ঝুলানো

প্রয়োজনে আমরা বস্তা ঝুলিয়ে রাখি এবং এর জন্য পাটের রশি, নাইলনের রশি অথবা শিকল ব্যবহার করে থাকি, এরপরেও মাঝে মধ্যে

বস্তা ছুটে কিংবা রশি ছিড়ে কারোর মাথায় পড়ে, কারো ঘাড় ভাঙ্গে। কিন্তু মৌমাছি একটি বস্তা ঝুলিয়ে রাখল গাছের ডালে, যাকে 'মৌচাক' বলা হয়। সুন্দরবনে কোন কোন মৌচাকে এক মণ পর্যন্ত মধু পাওয়া যায়, মৌচাকের তথা মধুপোকার বাসার ওজন আধা মনও হয়। আধামন ওজনের বাসা, একমন ওজনের মধু নিয়ে ঝুলে আছে গাছের ডালে। তাতো ছিঁড়ে পড়ে কারো মাথা বা ঘাড় ভাঙ্গেনি। তাহলে সে বড় ইঞ্জিনিয়ার? না আমরা বড় ইঞ্জিনিয়ার?

এরপরও কি কেউ মৌমাছিকে শিক্ষিত বলে? কেন বলে না? বুঝা গেল এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়।

মৌমাছি কি স্প্রীট ব্যবহার করে

আমরা বিভিন্ন বস্তুয়াদি ভাল রাখার জন্য স্প্রীট ব্যবহার করে থাকি অথবা অ্যালকোহল ব্যবহার করে থাকি, যাতে নষ্ট না হয়, এরপরও কি চিরদিন এটা ভাল থাকে? ওষুধের গায়ে মেয়াদ লেখা থাকে, মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ব্যবহার করতে হবে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ব্যবহার করলে লাভ হবে না, ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ ওষুধ ভাল রাখার জন্য স্প্রীট ব্যবহার করা হয়, তারপরও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মৌমাছি যে মহৌষধ মধু তৈরি করল, যে ওষুধের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে করেছেনঃ

وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ. ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ- আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেনঃ পর্বতগাত্রে, বৃক্ষে এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরি কর। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর। অতঃপর আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয় তাতে মানুষের জন্য রয়েছে

রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[8]

আপনি যে পাত্রে মধু রাখবেন যদি পাত্রটিতে কোন সমস্য না থাকে, কেয়ামত পর্যন্ত ঐ মধু নষ্ট হবে না। কী মেডিসিন বা স্প্রীট ব্যবহার করল এই মৌমাছি? আমরা বড় ডাক্তার? না মৌমাছি বড় ডাক্তার? না মৌমাছি বড় ইঞ্জিনিয়ার?

তারপরও কি কেউ মৌমাছিকে শিক্ষিত বলে? কেন বলে না? বলতে বাধা কোথায়? বুঝা গেল এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়, কারণ এগুলো মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

মৌমাছির হাজার কামরা বিশিষ্ট ঘর-বাড়ী

আমরা বাড়ী বানাই। পূর্ব থেকে ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে মাষ্টার প্লান করি। এরপরও দেখা যায় অমুক জায়গাটি নষ্ট হয়ে গেছে, কোন কাজে লাগল না। আমাদের বাড়ীতে কামরা বা রুম কয়টি হয় ৪ টি বা ৫ টি কিংবা ১০/২০ টি। আর মৌমাছি বাড়ী বানাল। তাতে রয়েছে হাজার হাজার কামরা ও বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী। আমাদের এক কামরায় একাধিক বাচ্চাও ঘুমায়। আর মৌমাছির প্রত্যেক বাচ্চার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কামরা। এক কামরায় একাধিক বাচ্চা থাকবে না, একজনই থাকবে। কত মূল্যায়ন বাচ্চার। বাচ্চা যে পরিমাণের কামরাও ঠিক সে পরিমাণের। পাঁচ কোণ বিশিষ্ট কামরা। কোন জায়গা নষ্ট হল না। সে যে হাজার হাজার কামরা তৈরি করল তা মাপ দিয়ে দেখবেন যে, কোন বেশকম নেই, সব কামরা সমান। আমরা বড় ইঞ্জিনিয়ার? না মৌমাছি বড় ইঞ্জিনিয়ার? তাই বলে কি কেউ তাকে শিক্ষিত বলে? শিক্ষিত বলতে বাধা কোথায়? বুঝা গেল এগুলো বুঝার নাম শিক্ষা নয়। কেননা এগুলো মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

---

[8] সূরা আন্-নাহল, ১৬ ঃ ৬৮-৬৯

মৌমাছি পথ হারায় না

আমরা বাজারে যাই, আগে সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন হাট বসতো, এখন গ্রামে গ্রামে বাজার, বাড়ীতে বাড়ীতে দোকান। আগের দিনে এগুলো ছিল না, বাজারে খুব ভিড় হতো। অনেক মানুষ বাজারে যেত, বাজার দূরে, তাই রাতে বাড়ী ফেরার সময় কত মানুষ দিশা হারিয়ে ঘুরতো, সকাল হলে দেখতো যে, সে উল্টো দিকে দশ কিলোমিটার দূরে চলে গেছে, বাড়ীর দিকে আসেনি। অথচ গত সপ্তাহেও সে বাজারে গিয়েছিল, মাত্র তিন-চার কিলোমিটার দূরে বাজার, তারপরও দিশা হারিয়ে চলে গেছে অন্য দিকে। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতম মৌমাছি ফুলের রসের তালাশে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরে চলে যায়, আবার সেখান থেকে এক চিমটি রস নিয়ে বাসায় ফিরে আসে। কোন মৌমাছি জীবনে কখনো রাস্তা ভুলেনি। মৌমাছি আশি কিলোমিটার দূর থেকে চলে আসল। নতুন জায়গায় গেল, যেখানে জীবনে কোন দিন যায়নি। এরপরেও সে পথ ভুলল না। আর আমরা পথ ভুলে যাই।

তাই বলে কি কেউ মৌমাছিকে শিক্ষিত বলে? এত কিছু জানার পরও তাকে শিক্ষিত বলতে আপত্তি কিসের? বুঝা গেল এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়, এগুলো বুঝার নাম শিক্ষা নয়, কেননা এগুলো মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

ইঁদুরের যুদ্ধ বাংকার

যুদ্ধের সময় মিলিটারিরা মাটির নিচে বাংকার খোদাই করে। যাতে করে শত্রু টের না পায়। গর্তের ভিতরে আসা-যাওয়ার জন্য দুয়ার রাখে, আবার চোরা দরজা কয়েকটা রাখে। বাংকারে শত্রু চলে আসলে যাতে চোরা দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।

ইঁদুর ক্ষেতের আইলে মাটির নীচে গর্ত করে বাংকার খোদাই করে, ক্ষেতের মালিক ইঁদুর বের করার জন্য গর্তে গরম পানি ঢালে, গরম পানি ঢেলেই মালিক প্রস্তুত, ইঁদুর এখন বের হবে। হাতে ধারাল অস্ত্র অথবা

লাঠি, ইঁদুর বের হলেই আঘাত করে মেরে ফেলবে। কিন্তু ইঁদুরও দু'চারটা চোরা দরজা খোদাই করে রেখেছে, উপরে মাত্র এক পল্লা মাটি আছে, বাকি সব খোদাই করে রেখেছে। এক দিক দিয়ে মালিক গরম পানি ঢালছে আর সে অন্য দিক দিয়ে ফুস করে বের হয়ে পালিয়ে গেল, মালিক শত্রু ধরতে পারল না। পানিও বেকার গেল, সময়ও বৃথা গেল, শ্রমও বরবাদ গেল। তাহলে আমরা বড় ইঞ্জিনিয়ার না ইঁদুর বড় ইঞ্জিনিয়ার? সে কি কখনো ট্রেনিং দিয়েছে? আমাদের তো কয়েক মাস ট্রেনিং দিতে হয়।

তাই বলে কি কেউ ইঁদুরকে শিক্ষিত বলে? কেন বলে না? এগুলো শিক্ষা নয় তাই বলে না। তাহলে বুঝা গেল এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়। কেননা এগুলো মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়।

উইপোকার বিল্ডিং

আমরা বিল্ডিং তৈরি করি, রড, সিমেন্ট, কংকর ও বালি ব্যবহার করি, এরপরও পাঁচ তলা, দশ তলা বিল্ডিং ধসে (ভেঙ্গে) পড়ে। যা পেপার- পত্রিকায় আপনারা দেখেন, পড়েন। উইপোকাও বিল্ডিং বানায়। কিন্তু সে বিল্ডিং কোথায় বানায়? সে বিল্ডিং বানায় পুকুর পাড়ে, বাঁশ ঝাড়ে, যেখানে সেখানে। মাটির নীচে কয়েক তলা আছে, উপরেও কয়েক তলা আছে। সে বাসা তৈরি করতে করতে মানুষের মাথা পর্যন্ত উঁচু করে ফেলে। রড, সিমেন্ট, বালি ও কংকর কিছুই নেই। কিন্তু তার এই বাসা যখন শুকিয়ে যায়, তখন লাঠি দিয়ে পিটালেও এই বাসা ভাঙ্গতে পারবেন না, এত শক্ত করে তৈরি করে রেখেছে। বলুন তো! সে বড় ইঞ্জিনিয়ার? না আমরা বড় ইঞ্জিনিয়ার?

তাই বলে কি তাকে কেউ শিক্ষিত বলে? কেন বলে না? কারণ, এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়। এগুলো জানার নাম যদি শিক্ষা হতো, তাহলে মুরগী, মৌমাছি, বাবুই পাখি, ইঁদুর ও উইপোকা ইত্যাদি পশু-পাখি ও পোকা-মাকড়কে মস্ত বড় শিক্ষিত বলতে হতো। অথচ কেউ এদেরকে মস্ত বড় শিক্ষিত তো দূরের কথা শিক্ষিতই বলে না। কেন বলে না? এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়, তাই বলে না। এগুলো জানা মানুষের

বৈশিষ্ট্য নয়। তাই মানুষের এ জানাকে শিক্ষা বলা যাবে না। এগুলো পশু-পাখি ও পোকা-মাকড়ও জানে। অতএব এগুলো জানার নাম শিক্ষা নয়। এবার বুঝুন! কী জানার নাম শিক্ষা, কী বুঝার নাম শিক্ষা?

শিক্ষার সংজ্ঞা

বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় আছে, শিক্ষা অধ্যায় (كتاب العلم)। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

শিক্ষা কাকে বলে? শিক্ষা বলে ঐ জ্ঞানকে, শিক্ষা বলে ঐ জানাকে, শিক্ষা বলে ঐ বুঝাকে, যেই জ্ঞানে, যেই জানায় এবং যেই বুঝায় পদস্খলন নেই, ভুল নেই, ত্রুটি নেই, ধোকা ও মিথ্যা নেই। এমন পদস্খলনমুক্ত, ভুলমুক্ত, দোষমুক্ত, ধোকা ও মিথ্যামুক্ত জানা এবং বুঝাকেই 'শিক্ষা' বলে।

কোন্ বুঝের মধ্যে ভুল নেই

এবার জানা প্রয়োজন যে, কোন্ বুঝার মধ্যে ভুল হয় না আর কোন্ বুঝার মধ্যে ভুল হয়। তাহলে সহজে বুঝা যাবে কাকে শিক্ষা বলে।

বুঝার প্রাথমিক মাধ্যম পঞ্চইন্দ্রিয়

আমরা কোন কিছু বুঝা ও জানার জন্য প্রথমে আমাদের দেহের পাঁচটি অঙ্গ ব্যবহার করে থাকি এগুলোকে পঞ্চইন্দ্রিয় বলা হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলো যথাক্রমে জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং ত্বক। ত্বক মানে চামড়া। এই পাঁচটি অঙ্গ ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা প্রাথমিকভাবে বুঝার চেষ্টা করি।

- অমুক বস্তুটি দেখতে কেমন দেখায়? চোখের মাধ্যমে বুঝি।
- আওয়ায কেমন বা কিসের? কানের মাধ্যমে বুঝি।
- আবহাওয়া ঠাণ্ডা নাকি গরম? চামড়ার মাধ্যমে বুঝি, কোন বস্তুতে চামড়া লাগালে বুঝে আসে তা ঠাণ্ডা নাকি গরম। জলন্ত কয়লার মধ্যে চামড়া লাগালে বুঝে আসে যে, কয়লা গরম।

❑ অমুক বস্তুতে স্বাদ (মজা) আছে কি নেই? জিহ্বার মাধ্যমে বুঝি।
❑ অমুক বস্তুতে ঘ্রাণ-গন্ধ আছে কি নেই? নাকের মাধ্যমে বুঝি।

মোটকথা, কোন কিছু বুঝার জন্য প্রাথমিকভাবে এই পাঁচটি অঙ্গ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এই পাঁচটি অঙ্গ ব্যবহার করে যা কিছু জানি বা বুঝি এই বুঝা আর এই জানার মধ্যে কি কোন ভুল হয় না? অবশ্যই হয়। পদস্খলন ঘটে, এর মধ্যে ত্রুটি থেকে যায়, ধোকা হয়ে যায়, মিথ্যারও অবকাশ থাকে। কিভাবে হয় শুনুনঃ

চোখের ধোকা

যেমন ধরুন, আপনি রেল লাইনে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে কিছুদূর পর দেখতে পাবেন যে, রাস্তার স্লীপার (লোহার সীক) চাপতে চাপতে একেবারে মিশে গেছে। আপনার কাছের দুটি স্লীপারের মাঝখানে এক মিটার ফাঁকা, দূরে এক মিটার ফাঁকা নেই। ফাঁকা থাকা না থাকার কথাটি চোখ বলছে। চোখের এই বলা কি ঠিক? মোটেও ঠিক নয়, সে ভুল বলছে, ধোকা দিচ্ছে। যদি চোখের উপর কোন ড্রাইভার আস্থাশীল হয়, সে ড্রাইভার কখনো গাড়ি স্টার্ট করবে? করবে না। কেন করবে না? তার চোখ বলছে এখানে যে পরিমাণ ফাঁকা আছে সামনে সে পরিমাণ ফাঁকা নেই, ওখানে গেলে গাড়ি এক্সিডেন্ট করবে, আর গাড়ি স্ট্রার্ট না করলে সে জীবনে কখনো গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে? পারবে না।

প্রচণ্ড খরার সময় কোন বিশ্বরোডে বা বড় মাঠে গিয়ে সামনের দিকে তাকালে দেখবেন, পানি ঝলমল করছে, মনে হয় ওখানে বৃষ্টি হয়েছে। আপনি যত এগিয়ে চলবেন পানিও তত এগিয়ে চলবে। বাস্তবে বৃষ্টি নয়, মরিচিকা, চোখের ধোকা, চোখ ধোকা দিয়ে দিল।

গাড়িতে বসেছেন, রেল হোক বা বাস, গাড়ি আপনাকে নিয়ে যখন ফুল স্পীডে সামনে চলবে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখবেন যে, দু'পাশের গাছ-গাছালি ও ঘর-বাড়ী দ্রুত গতিতে পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে। এ দৌড়ের কথাতো চোখ বলছে। চোখের বলাটি কি সত্য?

না, ধোকা? গাড়ি আপনাকে নিয়ে সামনে দৌড়াচ্ছে কিন্তু চোখ বলছে, এগুলো পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে। চোখ মিথ্যা বলল।

পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে দিনের বেলা সূর্য দেখি, রাতের বেলা দেখি চন্দ্র। সূর্যটা কত বড় দেখা যায়? একটা ভাতের প্লেটের ন্যায়। বেশির থেকে বেশি এক ফিট হবে তার দৈর্ঘ ও প্রস্থ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেনঃ সূর্য বাস্তবে আমাদের এই পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পৃথিবীর আয়তন হল ২০ কোটি বর্গমাইল। বিশ কোটিকে তের লক্ষ দিয়ে গুণ দিলে যে গুণফল হবে তা হবে সূর্যের আয়তন। এমন বিরাট বিশাল সূর্যের ব্যাপারে চোখ বলছে এর দৈর্ঘ ও প্রস্থ মাত্র এক ফিট। মিথ্যাইতো বলল। তাহলে বুঝা গেল চোখের মাধ্যমে যা কিছু বুঝব-জানব তা শিক্ষা নয়, কারণ তা ধোকামুক্ত নয়।

পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় পৃথিবী স্থির বসে আছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেনঃ পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে বিশ কিলোমিটার গতিতে ঘুরছে, বুঝা গেল চোখ মিথ্যা বলছে। অতএব, চোখের মাথ্যমে যা বুঝব বা জানব এগুলো শিক্ষা কিংবা ইলম নয়। কেননা এগুলো মিথ্যামুক্ত নয়, ধোকামুক্ত নয়।

কানের ধোকা

আসুন! কানের কাছে। পর্দার পিছন থেকে আওয়ায শুনা যাচ্ছে "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ"। কান বলছে- একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে সালাম দিচ্ছে। আপনি পর্দার ওপাশে গিয়ে দেখছেন, না, মানুষ নয়, তোতা পাখি অথবা টেপ রেকর্ড। কান সঠিক বলেনি, ধোকা দিয়ে দিল। অতএব, কানের মাধ্যমে যা কিছু জানব বা বুঝব এগুলো শিক্ষা নয়, ইলম নয়।

চামড়ার ধোকা

আসুন! চামড়ার কাছে। চৈত্র মাস! প্রচণ্ড খরা! দুপুর বেলা! একটি কামরার ভিতর দু'জন মানুষ। একজন বলছেঃ ভাই! ফ্যানটি একটু ছেড়ে

দিনতো, গরম লাগছে। আরেকজন বলছেঃ ভাই! কম্বল দিন, লেপ দিন, শীতে মারা যাচ্ছি। সে থরথর করে কাঁপছে। একজন শীতের কথা বলে আর কম্বল চায়। আরেকজন গরমের কথা বলে আর ফ্যান ছাড়তে বলে। একজনের চামড়া বলছে, আবহাওয়া গরম। অপরজনের চামড়া বলছে, আবহাওয়া ঠাণ্ডা। একই রুমের ভিতরে একই সময়ে আবহাওয়া গরম আর ঠাণ্ডা হওয়া কি সম্ভব? কিন্তু চামড়াতো দু'রকমই বলছে। নিঃসন্দেহে একজনের চামড়া মিথ্যা বলছে, ধোকা দিচ্ছে। তাহলে বুঝা গেল চামড়ার মাধ্যমে যা কিছু জানব বা বুঝব তা শিক্ষা নয়, ইলম নয়।

জিহ্বার ধোকা

আসুন! জিহ্বার কাছে। যে ব্যক্তি ফ্যান ছাড়তে বলছে তার জিহ্বায় এক টুকরা গুড় লাগিয়ে দেখুন, সে বলবে খুব মিষ্টি। আর যে কম্বল চাইছে ঐ গুড়টি তার জিহ্বায় লাগিয়ে দেখুন, সে বলবে তিতা লাগছে। তার গায়ে যে জ্বর উঠেছে। জ্বরওয়ালার জিহ্বা বলছে, গুড় তিতা। আর সুস্থ মানুষের জিহ্বা বলছে, গুড় মিষ্টি। একই গুড় তিতা আর মিষ্টি হওয়াতো সম্ভব নয়। অতএব, একজনের জিহ্বাতো মিথ্যা বলছে। তাহলে বুঝা গেল, জিহ্বার মাধ্যমে যা কিছু জানব বা বুঝব তা শিক্ষা নয়, ইলম নয়। যেহেতু তা ত্রুটিমুক্ত নয়, পদস্খলনমুক্ত নয়।

নাকের ধোকা

যে ব্যক্তি ফ্যান ছাড়তে বলছে তার নাকের সামনে একটি গোলাপ ফুল তুলে ধরুন! সে বলবে, মাশাআল্লাহ! কি সুন্দর মিষ্টি ঘ্রাণ! আর যে কম্বল চাইছে তার নাকের সামনে ধরুন! সে বলবে, না কোন ঘ্রাণ নেই। কারণ তার যে, নাকে সর্দি। তাই তার নাক অস্বীকার করছে যে, কোন ঘ্রাণ নেই। একজনের নাক বলছে ঘ্রাণ আছে। অপরজনের নাক বলছে কোন ঘ্রাণ নেই। একই ফুলে ঘ্রাণ থাকা আর না থাকা দুইটি বিপরীতমুখী গুণ একত্রিত হওয়া কি সম্ভব? অতএব বুঝা গেল একজনের নাক মিথ্যা বলছে। তাই নাকের মাধ্যমে যা কিছু জানব বা বুঝব তা শিক্ষা নয়।

কেননা এটা মিথ্যামুক্ত নয়, ধোকামুক্ত নয়। তাই এটা শিক্ষা বা ইলম নয়। মোটকথা, শুধুমাত্র পঞ্চইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে যা কিছু জানব ও বুঝব তা শিক্ষা নয়। কেননা তা ত্রুটিমুক্ত নয়, পদস্খলনমুক্ত নয়।

পঞ্চইন্দ্রিয়ের একটি সীমিত পরিধি আছে। এর ভিতরে এরা কিছু কাজ করতে পারে। এর বাইরেতো একেবারেই অচল। কান দিয়ে যদি দেখতে চান দেখা যাবে না। নাক দিয়ে যদি শুনতে চান শুনা যাবে না। অথচ কানের তুলনায় নাক মুখের আরো কত কাছে। কান শুনে, নাক শুনে না। চোখ দিয়ে যদি নিঃশ্বাস নিতে চান নিতে পারবেন না। তাদের নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে তারা কাজ করবে, এর বাইরে মোটেও কাজ করবে না। নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে কাজ করতে গিয়েও তাদের পদস্খলন ঘটে, তারা ভুল করে।

আকল ও বিবেক

তাই এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের পরিধির বাইরে চলার জন্য ও এদের ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আরো একটি নেয়ামত দান করেছেন, যাকে আকল বা বিবেক বলে। আকল পঞ্চইন্দ্রিয়ের ভুল ধরিয়ে দিবে যে, তুমি এখানে ভুল করছ। পঞ্চইন্দ্রিয়ের দৌড় যেখানে শেষ হবে সেখান থেকে আকল কাজ করবে। চোখ বলছে: রাস্তার দু'পাশের গাছ-গাছালি পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে, আকল বলছে: না... ভুল বলছো। বরং তুমি সামনের দিকে দৌড়াচ্ছো। গাছ-গাছালি পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে না, তারা আপন জায়গায় স্থির আছে। নাক বলছে, ঘ্রাণ নেই। আকল বলছে, ঘ্রাণ আছে, তোমার নাকে সর্দি, ঘ্রাণ উপলব্ধি করতে পারছ না। চামড়া বলছে, আবহাওয়া ঠাণ্ডা। কিন্তু আকল বলছে, না... গরম। বরং তোমার গায়ে জ্বর। এ জন্য তুমি গরম উপলব্ধি করতে পারছ না। জিহ্বা বলছে, গুড় তিতা। কিন্তু আকল বলছে, না... গুড় মিষ্টি। বরং তোমার গায়ে জ্বর। এ জন্য তুমি তিতা অনুভব করছো। আকল এই ভুলগুলি ধরিয়ে দেয়।

আকলের ত্রুটি

কিন্তু আকল যে ভুল করবে না তার কি কোন গ্যারান্টি আছে? না, তারও কোন গ্যারান্টি নেই। আকলও ভুল করে, যেমনঃ আগেকার যুগের বিজ্ঞানীরা ধারণা দিয়েছিলেন যে, "সূর্য স্থির থাকে আর পৃথিবী তার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়।" এর বহুকাল পর এ থিউরীর পরিবর্তন ঘটল যে, "না, সূর্য স্থির থাকে না বরং পৃথিবী স্থির থাকে আর সূর্য তার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়"। আগের ধারণার পুরো বিপরীত ও উল্টো ধারণা। এর বহুকাল পর আবার ধারণার পরিবর্তন ঘটল যে, "না... বাস্তবে সূর্যই স্থির আর অন্যান্য গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়।" আর এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, "কোন গ্রহ নক্ষত্রই স্থির নয়, না সূর্য, না পৃথিবী। বরং সব গ্রহ-নক্ষত্রই ঘোরে।"

এবার বুঝলেনতো 'বিজ্ঞানীদের থিউরী ও ধারণাও যে ঘোরে'। চার রকম ধারণা আর থিউরী এ পর্যন্ত আমাদের সামনে আসল। এগুলোতো সব আকলের ফসল। এ চারটি ধারণাই কি সঠিক হওয়া আদৌ সম্ভব? মোটেও নয়। তিনটি ধারণাতো নিঃসন্দেহে সঠিক নয়, ভুল ও ধোকা। আর একটি ধারণা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। ভবিষ্যতে পঞ্চম কোন ধারণা ও থিউরী আমাদের সামনে আসতে পারে যা এ চারটি ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিবে।

তাহলে বুঝা গেল, আকলও ভুল করে। অতএব, আকলের মাধ্যমে যা কিছু জানব ও বুঝব তাকেও শিক্ষা বলা যাবে না। যেহেতু তা ভুলমুক্ত নয়, ত্রুটিমুক্ত নয়।

একটি মারাত্মক ভুল

আমাদের বড় ভুলতো এখানেই হয়, আমরা আকলের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে, আমরা অনেকে মনে করি আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিই আমাদেরকে গন্তব্যে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে এমন নয়, বরং আকলও ভুল করতে পারে এবং ভুল করে।

আকল পথ দেখায়, চিনায় না

আমরা মনে করি আকল আমাদেরকে রাস্তা চিনাবে, গন্তব্যে নিয়ে যাবে। আমাদের ভুল এখানেই হয়। কেননা আকল গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ আকল হলো বাতি তুল্য। আর বাতির কাজ রাস্তা দেখানো, রাস্তা চিনানো নয়। রাস্তা চিনাবেতো পথপ্রদর্শক। 'রাস্তা দেখানো' আর 'রাস্তা চিনানো' এক কথা নয়। তেমনিভাবে আকলের কাজ হলো রাস্তা দেখানো, রাস্তা চিনানো নয়। আপনি এখান থেকে কুমিল্লা যাবেন, রাস্তা চিনেন না। অন্ধকার রাত, তাই অনেকগুলো বাতির ব্যবস্থা করলেন। হাতে, পায়ে, গলায়, সামনে, পিছনে শুধু বাতি বাঁধলেন। যেতে পারবেন কুমিল্লা? বাতিগুলো রাস্তা দেখাতে পারবে ঠিক। কিন্তু রাস্তা চিনাতে পারবে না। রাস্তা চিনাবেতো পথপ্রদর্শক। যে রাস্তা চিনায় না শুধু রাস্তা দেখায় তার কাছে রাস্তার পরিচয় চাওয়া বোকামী নয় কি? আমাদের আকল হলো বাতিতুল্য, সে পথ দেখায়, পথ চিনায় না।

ইকবাল মরহুম বলেনঃ

خرد کیا ہے چراغِ رہ گذر ہے ☆ خرد سے ظاہر وروشن بصر ہے
خرد واقف نہیں ہے نیک وبد سے ☆ بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے

আকল কী? আকল পথিকের বাতি
এর থেকে চোখ আরো ভাল কাজ করতে পারে।
আকল ভাল-মন্দ সম্পর্কে অজ্ঞ,
অনেক সময় এ জালেম সীমালঙ্ঘন করে ফেলে।

আকল সব সময় ভাল-মন্দের বিবেচনা করতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে যে, আকল এমন বস্তুকে ভাল বলবে যা বাস্তবে ভাল নয়। আবার কোন কোন সময় এমন বস্তুকে মন্দ বলবে যা বাস্তবে মন্দ নয়।

আকলের যুক্তিকথা

যেমন ধরুন, আপনার ঘরে একজন যুবক আছে, একজন যুবতীও আছে। ওরা সম্পর্কে ভাই-বোন। উভয়জনের বিয়ের সময় হয়ে গেছে।

আপনি আপনার ছেলের জন্য বউ তালাশ করছেন দুনিয়া ব্যাপী। আর মেয়ের জন্য স্বামী তালাশ করছেন দুনিয়া ব্যাপী। যতই তথ্য নিয়ে আপনি ছেলের জন্য মেয়ে বাছুনি করুন আর মেয়ের জন্য ছেলে। এ ছেলের চাল-চলন, হাব-ভাব এবং চাহিদা ঐ অচেনা মেয়েটা কি পুরাপুরি বুঝবে? বুঝবে না, কিছু না কিছু সমস্যা হবে। ঠিক এ রকম মেয়ের চাহিদা আর হাব-ভাবও ঐ অচেনা ছেলে পুরাপুরি বুঝবে না। আকল আর বিবেক এ কথা বলে যে, বাইরের অচেনা মেয়ে কেন ঘরে আনবে? আর অচেনা ছেলের হাতে কেন তোমার মেয়েকে তুলে দিবে? এদের মধ্যেই (ভাই আর বোনের মধ্যে) বিয়ে পড়িয়ে দাও। উভয়ে উভয়জনকে ভাল ভাবে চিনে, কার কি চাহিদা, কার কি তবীয়াত-স্বভাব, কার কি হাব-ভাব ও চাল-চলন ষোল আনা বুঝবে। ভাইয়ের ব্যাপারে বোন বুঝবে আর বোনের ব্যাপারে ভাই বুঝবে। বোন ভাইয়ের যে পরিমাণ হিতাকাঙ্খী হবে, অন্যেরা কি সে পরিমাণ হবে? কখনো নয়। আকলতো এ কথা বলে যে, এদের মধ্যেই বিয়ে পড়িয়ে দাও, সুখের সংসার গড়ে উঠবে। কিন্তু বিবাহ পড়িয়ে দেখুন না, কি অবস্থা হয়?

ইতিহাস সাক্ষী আছে, কিছু হিন্দুদের ব্যাপারে, এরা মাকে বিবাহ করেছে, বোনকে বিবাহ করেছে। যেমনঃ রাজা দাহির পাকিস্তানের সিন্দু প্রদেশের রাজা, সে তার আপন মাকে বিবাহ করেছিল, সে তার মাকে বিবাহ করে ব্যবহার করেছে। এমনিভাবে কেউ বোনকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু বিবাহের পর সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলছিল। সংসারে শান্তির বাতাস আর কোনদিন আসেনি। অথচ আকলতো এ কথা বলে যে, এদের মধ্যে বিবাহ পড়িয়ে দিলে অধিক শান্তি হবে কিন্তু বাস্তব এর বিপরীত। তাহলে বুঝা গেল, শান্তি-অশান্তি সব সময় আকল বিবেচনা করতে অক্ষম। সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, ভাল-মন্দের ব্যাপারে শুধু আকলের উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না, কেননা আকলও ভুল করে। তাই আকলের মাধ্যমে যা কিছু বুঝব ও জানব তা শিক্ষা নয়, ইলম নয়। কেননা এগুলো ত্রুটিমুক্ত নয়, ধোকামুক্ত নয়, নির্ভুল নয়।

ওহীই একমাত্র নির্ভুল শিক্ষার মাধ্যম

আকল যেখানে ভুল করে, আকলের দৌড় যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আরেকটি মহা দৌলত দান করেছেন। ঐ মহা দৌলতে কোন ভুল নেই, ত্রুটি নেই, ধোকা নেই। ঐ মহা দৌলতের নাম হলো "ওহী"। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসা "ওহী" কুরআন ও হাদীস। একটি وحى متلو (ওহীয়ে মাতলূ) আর অপরটি وحى غير متلو (ওহীয়ে গায়রে মাতলূ) এর মধ্যে কোন পদস্খলন নেই, ত্রুটি নেই, কোন ভুল নেই। এ জন্যইতো ওহী সম্বলিত কিতাবের প্রারম্ভে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেনঃ

ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ . هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ- আমার ওহী সম্বলিত কিতাব এমন একটি কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং তা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক।[9]

সে সব সময় সত্য বলবে, সঠিক তথ্য দিবে, তার কোনদিন পদস্খলন ঘটবে না, সে ধোকা দিবে না, মিথ্যা বলবে না, তার কোন তথ্য ত্রুটিযুক্ত হবে না, বরং ত্রুটিমুক্ত হবে।

لاَيَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِه

অর্থ- বাতিল ও অসত্য না তার (কুরআনের) পিছন থেকে আসতে পারে আর না সামনে থেকে।[10]

তাহলে বুঝা গেল, ওহীর মাধ্যমে যা কিছু জানব ও বুঝব তাকেই বলা হবে শিক্ষা ও ইলম। যেহেতু এর কোন ভুল নেই। আর এ শিক্ষাই মানুষের বৈশিষ্ট।

শিক্ষার এ মাধ্যমটি বিজাতির কাছে নেই। শুধু মুসলমানদেরই কাছে আছে। বিজাতির কাছে দু'টি বস্তু; পঞ্চইন্দ্রিয় ও বিবেক। আর আমাদের

[9] সূরা আল-বাকারাহ, ২ ঃ ২

[10] সূরা হা-মীম সিজদা, ৪১ ঃ ৪২

কাছে আছে তিনটি; পঞ্চইন্দ্রিয়, বিবেক ও ওহী। পঞ্চইন্দ্রিয়ের দৌড় যেখানে শেষ আকল ও বিবেকের দৌড় সেখান থেকে শুরু, আর আকলের দৌড় যেখানে শেষ ওহীর দৌড় সেখান থেকে শুরু, যার কোন শেষ নেই।

হ্যাঁ! বাকী শিক্ষাগুলো যদি ওহীকে ফলো (Follow) করে চলে, ওহীর নির্দেশনা মেনে চলে, অহীকে পথ প্রদর্শক হিসাবে মেনে চলে তাহলে (تبْعاً) প্রাসঙ্গিকভাবে রুপক অর্থে, এগুলোকেও শিক্ষা বলা যাবে। ওহীকে অবজ্ঞা করে চললে এগুলোকে আর শিক্ষা বলা যাবে না। বেশির থেকে বেশি "জীবিকা নির্বাহের একটি মাধ্যম" বলা যাবে। মোটকথা, শিক্ষা হলো একমাত্র ওহীর মাধ্যমে যা জানব ও বুঝব, আর ঐ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

অতএব এ কথা পরিস্কার হয়ে গেল যে, ওহীর জ্ঞান এবং ওহীর শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এ শিক্ষাই অমানুষকে মানুষ বানায়, মানুষের মাঝে পরিবর্তন ঘটায়, মানুষ কে? তা চিনায়।

اے اہل ہنر ذوق ہنر خوب ہے لیکن

جو اپنی حقیقت کو نہ جانے وہ ہنر کیا؟

ও জ্ঞানী! জ্ঞান পিপাসা তো অনেক ভাল। কিন্তু যে জ্ঞান নিজের
বাস্তবতা ও হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞ, তাকে কি জ্ঞান বলা যায়?

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن

جو شئ کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟

ও দূরদর্শী! দূরদর্শীতার রুচি তো অনেক ভাল। তবে যে
দূরদর্শীতা নিজেকে দেখে না তাকে কি দূরদর্শীতা বলা যায়?

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

আজ সূর্যের কিরণ পর্যন্ত বন্দি করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিজের জীবনের অন্ধকার দূর করতে পারলাম না। এটাকে কি শিক্ষা বলা যাবে?

شاعر کی نوی ہو کہ مغنی کا نفس ہو

جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا؟

বাতাস কবির সুর কিংবা গায়িকার নিঃশ্বাসের মত
সুন্দর ও মিষ্টি হলেও যদি এতে বাগান জ্বলে যায়। তাহলে কি
তাকে বাদে সাহার তথা ভোরের উপকারী বাতাস বলা যাবে?

সকাল বেলায় পূর্ব আকাশ থেকে হিমেল হাওয়া বয়ে চলছে। কি আরাম লাগছে! মানুষ কাপড়-চোপড় খুলে খালি দেহে বাতাস উপভোগ করছে। কিন্তু একটু পরে দেখা গেল, সে বাতাসের আছর আর প্রভাবে সারা শরীরে ঠোস পড়ে গেছে, চামড়া খসে পড়ে যাচ্ছে, গাছ-গাছালির পাতা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বাতাসটি সাময়িকভাবে যতই আনন্দদায়ক, শান্তিময় ও আরামদায়ক হউক না কেন এ বাতাস আল্লাহর রহমত নয় বরং গজব ও অভিশাপ। তেমনিভাবে যে শিক্ষা অর্জন করা সহজ, সুবিধাও আছে অনেক, সুযোগ রয়েছে বহু, আবার পয়সা কামাই করারও অসীলা হয়, কিন্তু যদি ঐ শিক্ষার আছর আর প্রভাবে মানুষ খোদা থেকে দূরে সরে যায়, মানুষ মানুষ না থাকে ও নিজেকে চিনতে না পারে, ঐ শিক্ষা কখনো শিক্ষা হতে পারে না। বরং এ শিক্ষা হবে তখন স্রষ্টার অভিশাপ ও লা'নত। (নাউযুবিল্লাহ!)

কলমের খোঁচায় লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি

চোর মসজিদে মুসল্লীদের জুতা চুরি করেছে। ধরা পড়লে তার পিঠে কত শত জুতা পড়ে, কত টাকা দামের জুতা চুরি করেছে? ৫০ টাকা অথবা ১০০ টাকা দামের। এর বিনিময়ে শত শত জুতা তার পিঠে পড়ে। পক্ষান্তরে আজ আমরা যাদেরকে শিক্ষিত মনে করি, এমন হাজার হাজার লোক কি এ দেশে নেই? যারা কলমের এক খোঁচা দিয়ে দেশ ও জাতির

লাখ লাখ টাকা চুরি করে ফেলে? ১০০ টাকার জুতা চুরি করার কারণে যদি শত শত জুতা পিঠে পড়ে, তাহলে কলমের খোঁচা দিয়ে যে ব্যক্তি লাখ লাখ টাকা চুরি করে তার পিঠে কত লক্ষ জুতা পড়া প্রয়োজন? তাকে তো তার শিক্ষা ফিরাতে পারল না যে, তুমি তো মানুষ, চোর নও, তুমি জাতির কর্ণধার, ধোকাদাতা নও। তার শিক্ষাতো তাকে ফিরাতে পারল না। তাহলে কি এ শিক্ষাকে শিক্ষা বলবেন?

দুধে পানি মিশানোর ঘটনা

ফারুকে আ'যম হযরত উমর রাযি. [হি.পূর্ব:৪০-২৪ হি.] যখন ক্ষমতায় [১৩-২৪হি.] ছিলেন। রাতের ঘুম ছেড়ে মদীনা ও মদীনার আশ-পাশের এলাকার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করতেন। একবার ভোর রাতে শুনতে পাচ্ছেন, এক ঘর থেকে আওয়ায আসছেঃ তাড়াতাড়ি দুধে পানি মেশাও, একটু পরেই তো দুধ বাজারে নিতে হবে। কচি কণ্ঠে উত্তর আসছে, 'না... দুধে পানি মেশানো যাবে না'। তাকে বলা হলঃ কেন যাবে না? তদুত্তরে সে বললঃ 'খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর নিষেধ করেছেন'। বলা হচ্ছে, খলীফাতো ঘুমে বিভোর, আমরা দুধে পানি মিশালে খলীফা কি দেখবেন? ছোট্ট মেয়ে উত্তর দিচ্ছেঃ 'খলীফা না দেখলে কি হবে, খলীফার খোদা কি দেখবেন না?' খলীফার খোদা কি ঘুমায়? আল্লাহু আকবার! لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) তন্দ্রাও আসে না, ঘুমও আসে না।[11] পানি মেশানো গেল না, ধোকা দেয়া গেল না। তাকে কে ফিরাল? ওহী তথা কুরআন-হাদীসের শিক্ষাইতো ফিরাল। আখেরাতমুখী শিক্ষাইতো ফিরাল।

ড. ইকবাল মরহুম বলেনঃ

جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا
اے قطرۂ نیساں وہ صدف کیا وہ گہر کیا؟

---

[11] সূরা আল-বাকারা, ২ ঃ ২৫৫

ভাদ্র মাসের অমাবস্যার রাতের
যে বৃষ্টির ফোটা সমুদ্র গভীরে কোন
আলোড়ন সৃষ্টি করতে না পারে,
মুক্তা জন্ম দিতে না পারে,
সে বৃষ্টি আর ঝিনুকের কী মূল্য?

যে শিক্ষা অন্তরের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না সে শিক্ষার কী মূল্য? এমন শিক্ষাকে কি শিক্ষা বলা যায়?

ড. ইকবাল মরহুম আরো বলছেনঃ

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن
کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت

অর্থাৎ- যে শিক্ষার আছর আর প্রভাবে নারীরা নারী থাকে না। পর্দা ছেড়ে দিয়ে পুরুষের ন্যায় রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, অফিস-আদালতে ও কলেজ-ভার্সিটিতে সমান অধিকারের দাবী নিয়ে বেরিয়ে আসে ঐ শিক্ষাকে শিক্ষা বলা চলে না। জ্ঞানী-গুণীদের দৃষ্টিতে ঐ শিক্ষা জাতির জন্য 'মউত' বা মৃত্যু তুল্য।

সত্য ও বাস্তব বলতে গেলে 'মৌলবাদী' অপবাদ আসবে। বলবে এরা নারী স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে, নারীর অধিকার হরণ করে। অধিকার আর স্বাধীনতা কী? তাতো বুঝলাম না।

লোহা ও সোনার স্বাধীনতা এক নয়

কটকটীওয়ালা কটকটী বিক্রি করে, কিসের বিনিময়ে? ভাঙ্গা বোতল, ভাঙ্গা পট, মরিচাওয়ালা টিনের টুকরা, রডের টুকরা ইত্যাদির বিনিময়ে। এগুলো নিয়ে কোথায় রাখে? বাজারের বাইরে রাস্তার কিনারায় ফেলে রাখে। স্তূপ বড় হয়ে গেলে ট্রাক ভাড়া করে সাপ্লাই দেয়। আর স্বর্ণকার স্বর্ণ কোথায় রাখে? বাজারের ভিতরে, দোকানের ভিতরে, কুঠরীর ভিতরে, আলমারীর ভিতরে। সবগুলোর সামনে তালা লাগানো থাকে, আবার

বাজারে চৌকীদার পাহারাদারীও করে। স্বর্ণ যদি বলেঃ এই পুরোনো লোহা, কাঁচ-ভাঙ্গা ইত্যাদি কি সুন্দর স্বাধীন জীবন যাপন করছে, মুক্ত আবহাওয়া ব্যবহার করছে ও মুক্তবাতাস খাচ্ছে আর আমাকে এখানে আলমারির ভিতরে বন্দি করে আমার স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে, আমার অধিকার হরণ করা হচ্ছে, এ কি ইনসাফ? এখন যদি কেউ স্বর্ণের উপর দয়াশীল হয়ে স্বর্ণকে ভাঙ্গাচুরা বস্তুর ন্যায় রাস্তার কিনারায় রেখে দেয়, তাহলে স্বর্ণের দাম বাড়বে? না কমবে? মুক্ত আবহাওয়াতো খাবে ঠিক, কিন্তু এর পাশাপাশি কুকুর-বিড়ালের পেশাব-পায়খানাও কপালে জুটবে। কুকুর-বিড়াল পেসাব-পায়খানা কোথায় করে? ঐ রাস্তার পাশে। এতে স্বর্ণের ইজ্জত বাড়লো? না আসল ইজ্জতটুকুও হারিয়ে গেল? বুঝা গেল স্বর্ণ ও লোহার স্বাধীনতা ও অধিকার এক নয়।

নারী-পুরুষের স্বাধীনতা ও অধিকার এক নয়

তেমনিভাবে নারী ও পুরুষের স্বাধীনতা ও অধিকারও এক নয়। এক হবেও বা কি করে! উভয়ের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে কত পার্থক্যঃ

(ক) গঠনের মধ্যে পার্থক্য;
(খ) কথা-বার্তার মধ্যে পার্থক্য;
(গ) আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য;
(ঘ) শক্তির মধ্যে পার্থক্য;
(ঙ) ধরণের মধ্যে পার্থক্য;
(চ) বুঝ-বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য;
(ছ) রং-রূপের মধ্যে পার্থক্য;
(জ) লাবন্যতার মধ্যে পার্থক্য;
(ঝ) কোমলতার মধ্যে পার্থক্য;
(ঞ) আকর্ষণের মধ্যে পার্থক্য ও
(ট) লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য।

এত পার্থক্য থাকার পরও স্বাধীনতা ও অধিকার এক হয় কি করে? কথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্য শোভা পায় নারী-পুরুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সমান হওয়ার দাবি করা। কোন জ্ঞানী-গুণী ও রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। পশ্চিমা বিশ্বের ধোকায় পড়ে এবং আমাদের দেশের তথা কথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভনে পড়ে এখন নারীরা সমান অধিকারের দাবি নিয়ে বেপর্দায় বেরিয়ে আসছে। ফলে তারা ভাঙ্গা-চুরা লোহা ও কাঁচ ভাঙ্গার মত মুক্ত আবহাওয়া খায়, এর পাশাপাশি এসিডও খায়, কখনো অপহৃতা হয়, আবার কখনো ধর্ষিতাও হয়। ভেবে দেখুন দোষটি কার?

اے مخنث نئے تو مر دونئے تو زن
مثل شیطاں راہ مرداں رامزن

হে ক্লিবলিঙ্গ! তুমি না পুরুষ না নারী।
শয়তানের ন্যায় মানুষদের বিপথগামী করো না।

ক্লিবলিঙ্গ এ জন্য বলছি, যদি পুংলিঙ্গ হতো, তাহলেতো সমান অধিকারের দাবী করত না। আর যদি স্ত্রীলিঙ্গ হতো তাহলে বেপর্দায় বেরিয়ে আসত না, পর্দায় থাকতো।

যে শিক্ষার আছর আর প্রভাবে আমাদের এ দশা ঘটেছে, ইকবাল মরহুম বলেন, এটা শিক্ষা নয় বরং জাতির জন্য মৃত্যু তুল্য।

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن
کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت

যে শিক্ষার প্রভাবে নারী নারী থাকে না, সে শিক্ষাকে
জ্ঞানী-গুণীগণ (জাতির) মউত বলে আখ্যায়িত করেন।

মাইক্রোফোন গাছের আগায়

আসলে যে বস্তু যে বানায় সে জানে ঐ বস্তু কিভাবে ব্যবহার করলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। কোন বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে হলে বানানেওয়ালা ও আবিস্কারকের নিয়ম-নীতি এবং ফর্মুলা অনুযায়ী ঐ বস্তু

ব্যবহার করতে হয়। তবেই তা দ্বারা যথাযথ উপকৃত হওয়া যায়। বানানেওয়ালার ফর্মুলা লঙ্ঘন করলে ঐ বস্তু মারা যায়, তার থেকে আর কাজ নেওয়া সম্ভব হয়না।

যেমন ধরুন, আমার সামনের মাইকটি। কেন আবিস্কার করা হলো? আওয়াজ বড় করার জন্য। মাইক যিনি আবিস্কার করলেন, মাইকের পার্টস ও অঙ্গগুলো তথা মাইক্রোফোন, হর্ণ, মেশিন ও ব্যাটারী ব্যবহার করার ব্যাপারে তারই নীতি ও ফর্মুলা মেনে চলতে হবে। অন্যথায় মাইক দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে না, মাইক মারা যাবে। আবিস্কারকের ফর্মুলা হলো, মাইক্রোফোন থাকবে বক্তার সামনে, হর্ণ থাকবে গাছের আগায় অথবা বিল্ডিং এর ছাদে, মেশিন থাকবে মধ্যখানে, ব্যাটারীও থাকবে মধ্যখানে, এরপর তারের মাধ্যমে সংযোগ দিয়ে মাইক্রোফোনে কথা বললে মাইক থেকে কাজ নেয়া সম্ভব হবে। মাইক দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে, অর্থাৎ মাইক থেকে বড় ও উচ্চ আওয়াজ পাওয়া যাবে।

আপনি এক সেট মাইক ক্রয় করলেন, মাইক অপারেটর আবিস্কারকের নিয়ম অনুযায়ী মাইক ফিটিং করছে, আপনি বলছেনঃ এভাবে ফিটিং করছ কেন? সে বলছে আবিস্কারকের বাতলানো নিয়মতো তাই। আপনি বলছেনঃ আমি মাইকের মালিক, আবিস্কারকের নিয়ম ও ফর্মুলা মানব কেন? আমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করব, অধিকার আমার। আমি স্বাধীনভাবে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করব। শোন! মাইক্রোফোনটি গাছের আগায় ঝুলাও, হর্ণ ওখানে মাটিতে উপুর করে রাখ, মেশিন আপন জায়গায় রাখ আর ব্যাটারীটি আমার সামনে দাও, এবার তার দিয়ে জয়েন্ট দিয়ে দাও। অতঃপর গায়ের জোর যতটুকু আছে সবটুকু দিয়ে চিৎকার দিলেন, মাইক দিয়ে আওয়াজ বের হবে? হবে না। কেন হবে না? মাইক মারা গেছে, মারা গেল কেন? বানানেওয়ালার ফর্মুলা ও নিয়ম-নীতি মানা হয়নি, তাই মাইক মারা গেছে। অতএব, তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যাচ্ছে না, তার থেকে কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না।

আল্লাহ পাক যেন বলছেনঃ ও মানুষ! আমি তোমাদের আবিস্কারক, তোমাদেরকে দুইটি পার্ট করে সৃষ্টি করেছি। একটি পার্ট এর নাম পুরুষ, আরেকটি পার্ট এর নাম নারী।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً

অর্থ- হে মানুষসকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একটি সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন বহু পুরুষ ও নারী।[12]

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى

অর্থ- অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল- নর ও নারী।[13]

কোন পার্ট কোথায় থাকলে মানব জাতি জিন্দা থাকবে এবং তাদের থেকে উপকৃত হওয়া যাবে, তা একমাত্র আমি সৃষ্টিকর্তা ও আবিস্কারক বুঝি। আমার ফর্মুলা আর নিয়ম-নীতি হলো: নারী জাতি থাকবে পর্দার আড়ালে ঘরের ভিতরে, আর পুরুষ জাতি থাকবে পর্দার বাইরে দায়-দায়িত্ব নিয়ে।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلى

অর্থ- তোমরা তোমাদের ঘরেই অবস্থান কর, জাহিলিয়াত যুগের নারীদের ন্যায় বেপর্দায় বের হয়ো না।[14]

এভাবে যদি তোমরা ব্যবহৃত হও তাহলে মানব জাতি জিন্দা থাকবে। তাদের থেকে উপকৃত হওয়া যাবে আর যদি তার বিপরীত ঘটে অর্থাৎ আমার দেয়া নিয়ম-নীতি লংঘন কর, ভিতরের নারী জাতিকেও বাইরে বের করে নিয়ে আস তাহলে মানব জাতি মারা যাবে অর্থাৎ মানুষ

---

[12] সূরা আন্-নিসা, ৪ ঃ ১

[13] সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ৩৯

[14] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৪

আর মানুষ থাকবে না এবং তাদের থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে না। সারাবিশ্বে অশান্তি বিরাজ করবে। বর্তমানে তাই হচ্ছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِيْ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْ النَّاسِ

অর্থ- জলে-স্থলে সর্বত্র যে অশান্তি বিরাজমান, তা একমাত্র মানুষের কৃত কর্মেরই ফল।[15]

নারীদেরকে ঘর থেকে বের করলাম আর শান্তি বিদায় নিয়ে গেল। একটি শিক্ষার প্রভাবেইতো এমনটি ঘটল।

ড. ইকবাল মরহুম বলেনঃ

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن
کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت
وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں
جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو

যে শিক্ষার প্রভাবে নারী নারী থাকে না,
সে শিক্ষাকে জ্ঞানী গুণীগণ (জাতির) মউত বলে আখ্যায়িত করেন।
যে শিক্ষার উদ্দেশ্য পয়সা কামানো সে শিক্ষা শিক্ষা নয়,
সে শিক্ষা জাতির জন্য বিষতুল্য।

কোচিং সেন্টার

আজ আমাদের দেশে হাজার হাজার কোচিং সেন্টার গড়ে উঠছে। অলিতে-গলিতে, চিপা-চাপায় কোচিং সেন্টার দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে, সাইনবোর্ডে, কত আকর্ষণীয় নাম দেখা যায়। কোচিং সেন্টারের এ্যাড দেখা যায়। বলুনতো! এ কোচিং সেন্টারগুলোর উদ্দেশ্য জাতিকে শিক্ষিত বানানো, না পয়সা কামানো? পয়সা কামানো। এজন্যইতো যেভাবে

[15] সূরা আর-রূম, ৩০ ঃ ৪১

কোচিং সেন্টার খুললে পয়সা বেশি আসবে সেভাবে খোলা হচ্ছে। যেভাবে খুললে লেখাপড়া বেশি হবে সেভাবে নয়।

বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে নিয়ম করা আছে, একজন ছাত্র যদি দু'জন ছাত্রকে ভর্তি করাতে পারে তাহলে ঐ দু'জন থেকে যে ফিস পাওয়া যাবে তার একভাগ ঐ প্রথমজনকে দিয়ে দেওয়া হবে। ঐ দু'জন আরো চারজনকে ভর্তি করাতে পারলে চারজনের ফিসের একাংশ দু'জনকে আর কিছু অংশ প্রথমজনকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নেটওয়ার্ক পদ্ধতির ব্যবসা।[16] এখন ছাত্ররা লেখাপড়া তাঁকের উপর রেখে 'তাবলীগে',নেমেছে! 'তাবলীগ' মানে 'মসজিদ থেকে দ্বীনের দাওয়াতের তাবলীগ নয়', 'ছাত্র জোগাড় করার তাবলীগ'! এখন ছাত্রের পিছনে চলছে 'গাশ্‌ত'! মসজিদে আসার গাশ্‌ত নয়, কোচিং সেন্টারে আসার গাশ্‌ত! আসো অমুক কোচিং সেন্টারে ভর্তি হও। এরপর তুমি আরো ছাত্র ভর্তি করাতে পারলে এত এত টাকা পাবে। এখন লেখাপড়া একদিকে রেখে ছাত্রের পিছনে গাশ্‌ত চলছে। এর নাম কি জাতিকে শিক্ষিত বানানো?

পক্ষান্তরে আমাদের বাংলাদেশে আমার জানা মতে বিশ হাজারের বেশি কওমী মাদরাসা আছে। কোন একটি মাদরাসার পক্ষ থেকে পয়সার বিনিময়ে কোচিং সেন্টার খোলা হয়েছে, কেউ দেখাতে পারবেন? কেন, খোলা হলো না? কারণ, এরা বুঝে যে, আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য 'পয়সা কামানো নয়' বরং আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো 'অমানুষকে মানুষ বানানো', 'আল্লাহ পাকের বান্দাদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক জুড়ে

---

[16] "ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির (ইন্টার-পার্সোনাল) সম্পর্কে ব্যবহার করে মৌখিক বিজ্ঞাপনজনিত প্রচারের মাধ্যমে পণ্য (বা সেবা) বিপণন করা এবং এ ধরণের বিপণনে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পণ্য (বা সেবা) উৎপাদনকারী বা উৎস থেকে ভোক্তার কাছে সরাসরি ক্রয়/বিক্রয় (সেবা দান/গ্রহণ) সম্পন্ন করা। বাড়তি খরচ পরিহার করে তা একটা বিশাল অংশ ক্রয়/বিক্রয়কারী (সেবা দান/গ্রহণকারী) ভোক্তা শ্রেণীকে একত্রে প্রচার কর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য 'কমিশন' প্রদান করাই হচ্ছে এ বিপণন পদ্ধতির মূল দর্শন।" মোহাম্মদ রফিকুল আমীন, সেলস এন্ড মার্কেটিং প্লান, পৃ. ৩, সংস্করণ: মার্চ ২০০৮, ডেসটিনি সেলস ট্রেনিং সেন্টার। একে ডাইরেক্ট মার্কেটিং ও মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এম,এল,এম) বলে। **এ পদ্ধতির কারবার শরী'আত অসম্মত ও নাজায়েয**। (মা'সূম বিল্লাহ) দেখুন, "ইসলাম ও এম.এল.এম" নামক বইটি।

দেয়া' । এ জন্য পয়সার কোন প্রশ্ন নেই । বরং শিক্ষক যদি কোন ছাত্রের কোন বিষয়ে দুর্বলতা ধরতে পারেন তাহলে তাকে ডেকে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেনঃ বাবা! তোমার অমুক বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে, আসরের নামাযের পর আমার কাছে অথবা যে কোন সময়ে আমার কাছে আসলে আমি তোমার দুর্বলতা সারিয়ে দিব, পয়সার কোন প্রশ্নই নেই । কিভাবে তাকে শিক্ষিত বানানো যায়, মানুষ বানানো যায়, এ চিন্তা আর ফিকির সব সময় শিক্ষকের মাথায় লেগেই আছে ।

দুই ছাত্রের মাঝে পার্থক্য

ওহী তথা কুরআন ও হাদীসের লাইনে যারা পড়ছে আর অন্য লাইনে যারা পড়ছে, জাতি একেও ছাত্র বলে, ওকেও ছাত্র বলে । পক্ষান্তরে উভয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে!

ড. ইকবাল মরহুম বলেছেনঃ

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

অর্থাৎ- দু'টি পাখি এক জায়গায় উড়ে, এরা জমিন থেকে অনেক উপরে উড়ে । একটি হলো শকুন, আরেকটি হলো শাহীন (বাজ পাখি) । উভয় পাখির উড়ার জায়গা এক, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন । শকুন উপরে উড়ে আর নিচের দিকে তাকায়, কোন্ জায়গায় মরা গরু আছে । মরা গরু দেখতে পেলে সে ওখানে এসে মরা গরুর গোশ্ত খায় । আর শাহীন (বাজ পাখি) ওখানে উড়ে আর নিচে তাকায়, কোন্ জিন্দা পাখিটি তার দলবল ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । অতঃপর সে সেখানে এসে ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে ঐ জিন্দা পাখিটিকে খেয়ে ফেলে । শকুন আর শাহীন এর মাঝে ব্যবধান কত? জিন্দা আর মুর্দার মাঝে ব্যবধান যত ।

ঠিক তেমনিভাবে একজন ছাত্র ভাঙ্গা ঘরে, ছেড়া হোগলা পাতার চাটাইয়ে বসে বসে ب ت ث । জপতেছে, জাতি তাকেও ছাত্র বলে । আর একজন ছাত্র মনোরম ঘরে শাহী ঠাট-বাটে বসে A B C জপতেছে । জাতি

ঐ ছেলেকেও ছাত্র বলে। উভয়জনকে ছাত্র বলছে ঠিক কিন্তু উভয়ের মাঝে ব্যবধান কত? A B C জপনেওয়ালা ছাত্রের উদ্দেশ্য হলো কিভাবে ভবিষ্যতে পয়সা কামাই করা যায় অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হলো মুর্দা দুনিয়া । পক্ষান্তরে ب ت ث । জপনেওয়ালা ছাত্রের উদ্দেশ্য হলো কিভাবে জিন্দা খোদাকে হাত করা যায়। এ ছাত্র বুঝে যে, আমার এ জগতে আগমন মুর্দা দুনিয়া কামানোর জন্য নয় বরং জিন্দা খোদাকে হাত করার জন্য। খোদার যে সমস্ত বান্দারা খোদা থেকে দূরে সরে গেছে তাদেরকে কিভাবে টেনে টেনে আবার খোদার সাথে মিলিয়ে দেয়া যায়, খোদার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেয়া যায়। এই লক্ষ্যেই আমার আগমন। এ জন্য ধনী হওয়ার কোন ফিকির নেই, সে সব সময় লেখাপড়ায় মগ্ন।

পক্ষান্তরে, যারা অন্য লাইনে পড়ে, তাদের প্রতিষ্ঠান ছুটি হলে দেখা যায় তারা কি অবস্থা করে। ১০/১২ জন ছাত্র যদি এক বাসে উঠতে পারে তাহলেতো আর কথাই নেই। বাস কনট্রাকটরের সাথে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করে তার মাথা খারাপ করার কথাতো বলাই বাহুল্য। এর পাশাপাশি সকলে মিলে চিল্লাচিল্লি এবং এমন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, যা একজন ভদ্র মানুষের জন্য বড়ই কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। আফসোস! পরবর্তিতে এরাই হবে বড় শিক্ষিত এবং দেশ ও জাতির কর্ণধার। এবার বলুনঃ এ জাতি ও দেশের অবস্থা কি হবে?

کر گس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

بلبل ہمہ تن خون شد و گل شد ہمہ تن چاک

ای وائے بہارے اگر این ست بہارے

অর্থাৎ ফুলের প্রেমিক বুলবুল পাখি বাগানে ঢুকেছে ফুলের সাথে সাক্ষাত করবে, বাগানে ঢুকে দেখে, ফুল নেই, পাতা নেই, গাছ-গাছালি উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে, ফুলের বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে গাছের ডালের সাথে মাথা পিটতে পিটতে সারা দেহ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তাকে বুঝানো হচ্ছে, ও বুলবুল! এটাতো বসন্তকাল। বুলবুল

জবাব দেয়, যে কালে গাছের ডালে পাতা থাকে না, ফুল আসে না এ কালের নাম যদি বসন্তকাল হয় তাহলে এমন বসন্তকালের উপর বুলবুল হাজার বার অভিশাপ পাঠায়।

তেমনিভাবে যে শিক্ষা কোন পরিবর্তন আনে না, যে শিক্ষা অন্তর ও সুরত-সীরাতে কোন বিপ্লব ঘটায় না বরং তার বিপরীত করে পরিবর্তন, সে শিক্ষা শিক্ষা নয়। বরং সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ। বাস্তবে এটা জীবিকা নির্বাহের একটি পন্থা মাত্র।

জেনারেল শিক্ষা কি শুধু জীবিকা নির্বাহের একটি পন্থা?

কেউ আবার ভুল বুঝতে পারেন যে, আমি জেনারেল শিক্ষার বিরোধিতা করছি। না, মোটেও নয়। আমার দৃষ্টিতে জেনারেল শিক্ষাও ফরজে কেফায়া পর্যায়ের। না হয় দেশ চলবে কি করে? দুনিয়া চলবে কি করে? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও পলিটিশিয়ান ইত্যাদি সব কিছুরই প্রয়োজন আছে, তবে ওহীকে মেনে চললে। কিন্তু অহীকে অবজ্ঞা করে চললে জীবিকা নির্বাহের একটি পন্থাই হবে মাত্র, আর এ পন্থাকে শিক্ষা বলবেন কি করে?

ইঞ্জিনিয়ার স্ত্রীর কাণ্ড

ধরুন, আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার মহিলা বিয়ে করেছেন। সে সকালে নাস্তার কোন ব্যবস্থা করেনি, না নিজে, না কর্মচারীদের মাধ্যমে। অথচ আপনি যথেষ্ট কর্মচারির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ নাস্তার ব্যবস্থা কেন করলে না? উত্তর দিলঃ আমি এ সময় আপনার ঘরের প্রস্থ মেপে দেখি, ঘরটি কত ফিট চওড়া।

দুপুরে খাবার তৈরী করেনি। কারণ জানতে চাইলেন, বললঃ আমি এ সময় আপনার ঘরের দৈর্ঘ্য মাপি , আর বুঝতে চেষ্টা করি যে, আপনি কত লম্বা ঘর বানিয়েছেন।

রাতে ঘরে আসলেন, তখনও কোন খাবারের ব্যবস্থা করা হয়নি। জিজ্ঞেস করলেন, খাবার কই? বললঃ আমিতো ঘরের উচ্চতা মাপে ব্যস্ত। একটু পরে শুতে আসলেন, দেখেন যে, আপনার ইঞ্জিনিয়ার স্ত্রী বিছানায় নেই। আর বিছানা-পত্রও তৈরী নেই। জানতে চাইলেন, বিছানা-পত্র তৈরী নেই কেন? তুমি শুতে আসছ না কেন? সে বলছেঃ আপনার ঘরের ওজন মাপ দিচ্ছি। ঘরের মোট ওজন কত, তাতো জানতে পারিনি, তাই ঘরের ওজন ঠিক করায় ব্যস্ত আছি।

বলুনঃ এগুলো কি স্ত্রীর গুণ হিসেবে ধর্তব্য হবে? এমন স্ত্রীকে কি স্ত্রী হিসেবে রাখবেন? না, এক-দুই-তিন কথা বলে সাদরে-সুসম্মানে বিদায় দিবেন?

হ্যাঁ, যদি সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার ঠিক থাকতো আর আপনার পাশে শোয়াও ঠিক থাকতো এরপর ঘরের দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা ও ওজন মাপ দিত তাহলে আর কোন সমস্যা ছিল না, বরং এগুলো স্ত্রীর গুণ হিসেবে ধর্তব্য হয়ে এ স্ত্রীর কদর ও মূল্য আরো অনেক বেড়ে যেত।

তেমনিভাবে যদি ওহীকে ফলো (Follow) করে, শরী'আতের হুকুম-আহকাম মেনে ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি করা হয় তাহলে অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য এবং তাকেও শিক্ষা বলা যাবে। কিন্তু ওহীকে অবজ্ঞা করে চললে ঐ ইঞ্জিনিয়ার স্ত্রীর ন্যায় এগুলোকে আর শিক্ষা বলা যাবে না বরং জীবিকা নির্বাহের একটি মাধ্যম বলা যাবে মাত্র।

শিক্ষিতদের বিভিন্ন উপাধীর বিশ্লেষণ

তালিবে ইলম

এ কথা যে শুধু ইকবাল মরহুম বলেছেন তা নয়, আপনারাও বলেন। দেখুন! যখন একটা ছেলে কওমী মাদরাসায় ভর্তি হয় তখন আপনারা সকলে তাকে 'তালিবে ইলম' বলেন। কেন তাকে 'তালিবে ইলম' বলেন? এর কি অর্থ? 'তালেব' কর্তাবাচক শব্দ। এর অর্থঃ তালাশকারী,

অন্বেষণকারী। আর 'ইলম' মানে শিক্ষা। 'তালিবে ইলম' অর্থঃ শিক্ষা অন্বেষনকারী, জ্ঞান তালাশকারী। সকলেইতো তাকে বলছেন: 'শিক্ষা অন্বেষণকারী'। কিন্তু অন্য লাইনে ভর্তি হলে কি তাকে 'তালিবে ইলম' বলেন? কেন বলেন না? বাধা কোথায়? বরং কেউ যদি তাকে 'তালিবে ইলম' বলেও সে এই উপাধিটি গ্রহণ করতে রাজী হবে? হবে না, বলবে: চাচা মিয়া! আপনি আমাকে 'তালিবে ইলম' বললেন? আমি কি 'তালিবে ইলম'? তাহলে তুমি কি বাবা? তখন সে বলবে আমি Student, সে 'তালিবে ইলম' উপাধিটা গ্রহণ করতে রাজী নয়। তার মানে সে একথা বুঝাতে চাচ্ছে যে, আমি যা শিখছি তা শিক্ষা নয়। অন্যথায় তাকে 'তালিবে ইলম' বললে তার জন্য উপাধিটি গ্রহণ করতে বাধা কি ছিল?

কওমী মাদরাসার ছেলেটাকে যে 'তালিবে ইলম' বললেন অর্থাৎ শিক্ষা অন্বেষণকারী বললেন, আপনারা কি কোন দিন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? যে ছেলেটি কওমী মাদরাসায় ভর্তি হবে তাকে 'তালিবে ইলম' বলবো আর অন্য লাইনে ভর্তি হলে তাকে ছাত্র কিংবা Student বলবো। এ রকম কোন পরামর্শের ভিত্তিতে কেউ সিদ্ধান্ত নেননি। এমনিতেই সকলের অন্তরে উপাধিটা এসেছে? এর কারণ হলো হাদীস শরীফে আছেঃ

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- : عن النبي صلى الله عليه و سلَّم قال : إذا أحبَّ الله العبدَ نادَى جِبرِيلَ : إنَّ الله يُحِبُّ فلاناً فأَحْبِبْه ، فيُحِبُّه جِبريلُ ، فيُنادِي جبريلُ في أهلِ السَّماء : إنَّ الله يُحِبُّ فلاناً فأَحِبُّوه فيُحِبُّه أهلُ السَّماء ، ثم يُوضَعُ له القبولُ فى الأرض.»[١٧]

অর্থাৎ যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি হযরত জিবরীল আমীনকে ডেকে জানিয়ে দেন, ও জিবরীল! অমুক

---

[17] أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، ١: ٤٥٦ ، ٢: ٨٩٢ ، رقم الحديث : ٣٢٠٩ ، ٦٠٤٠ ، ٧٤٨٥ . و أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده ، رقم الحديث : ٢٦٣٧ .(معصوم بالله)

বান্দাকে আমি ভালবাসি, অতএব তুমিও ভালবাস। তখন হযরত জিবরীল আমীন ঐ বান্দাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেন এবং এর পাশাপাশি তিনি আকাশের ফেরেশতাদের ডেকে জানিয়ে দেন যে, ও আকাশের ফেরেশতারা! অমুক বান্দাকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন, আমি ভালবাসি, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আকাশের ফেরেশতারা ঐ বান্দাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেন এবং যমীনের ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেন যে, ও যমীনের ফেরেশতারা! অমুক বান্দাকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন, হযরত জিবরীল আমীন ভালবাসেন, আমরা ভালবাসি, অতএব তোমরাও ভালবাস। যমীনের ফেরেশতারা তখন ঐ বান্দাকে ভালবাসতে থাকেন এবং তার ভালবাসা শুধু মানুষ নয় বরং প্রত্যেকটি মাখলুকের অন্তরে ঢুকিয়ে দেন। অতঃপর সমস্ত মাখলূক তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করে।[18]

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ. এর নাম শুনেছেন তো? আমরা তাঁকে ভালবাসি কি বাসি না? ভালবাসি। কেন তাঁকে ভালবাসি? জীবনে কোন দিন তিনি আমাদেরকে দশ টাকা দিয়েছিলেন? কোন দিন তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়েছিল? এক-দু বেলা দাওয়াত খাইয়েছিলেন? কিছুই নয়। তারপরও আমরা তাঁকে কেন ভালবাসি? এ ভালবাসা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যম হয়ে সকলের অন্তরে ঢুকেছে। প্রথমে তাকে আল্লাহ পাক ভাল বেসেছেন। এখন যে শুধু মানুষ তাকে ভালবাসে তা নয় বরং প্রত্যেকটি মাখলুক তাকে ভালবাসে।

হাকীমুল উম্মতের বিড়ালের জীবন উৎসর্গ

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ. এর দরবারে একটি বিড়াল ছিল। একদিন বাবুর্চি ডাল পাক করে রান্না ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। এমতাবস্থায় একটি বিষাক্ত সাপ

[18] সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৫৬ ও খ. ২, পৃ. ৮৯২, হাদীস নং ৩২০৯, ৬০৪০, ৭৪৮৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৩৭। (মা'সূম বিল্লাহ)

ঘরের খুঁটি বেয়ে শাহ্তীর হয়ে এক পাশ থেকে অপর পাশে যাওয়ার পথে ডালের পাতিল বরাবর উপরে গেলে ডালের পাতিলে পড়ে যায়। মাত্র বাবুর্চি ডাল পাক করে গেছে। গরম ডালে পড়ে সাপটি মারা যায়। কিন্তু ঘটনাটি কেউ দেখেনি। দেখেছে একমাত্র ঐ বিড়ালটি। একটু পরে বাবুর্চি পাকঘরে এসেছে। এখন বিড়াল বাবুর্চিকে বলবে যে, ডালগুলো খাওয়া যাবে না, ডালে সাপ পড়েছে। কিভাবে বলবে? বিড়াল যে ভাষায় বলতে পারে বাবুর্চি সে ভাষা বুঝে না আর বাবুর্চি যে ভাষা বুঝে বিড়াল সে ভাষা বলতে পারে না। বিড়ালের তো ভাষা একটাই: ম্যাঁও ম্যাঁও। তাই সে আগের তুলনায় ম্যাঁও ম্যাঁও বাড়িয়ে দিল, বাবুর্চি কি বুঝে? বিড়াল কেন এত বেশি ম্যাঁও ম্যাঁও করছে!

تو ندیدی گاہ سلیمان را

توچہ دانی آواز مرغان را

পশু পাখির ভাষা হযরত সুলাইমান (আ.) বুঝতেন।
আমরাতো কখনও তাকে দেখিনি, পশু পাখির ভাষা বুঝব কি করে?

বিড়াল দেখল, বুঝাতে পারলাম না। সে বাবুর্চির লুঙ্গি ধরে টেনে ডালের পাতিলের দিকে নিতে চায়। বাবুর্চি বিড়ালকে লাথি মেরে সরিয়ে দেয় আর ভাবে বিড়ালটির মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সে এমন করছে কেন? বিড়াল দেখলো, বুঝাতে পারলাম না। রশির মধ্যে বাবুর্চির কাপড়-চোপড় ঝুলছে, বিড়াল লাফ দিয়ে উঠে সেখান থেকে কাপড় নিয়ে ডালের পাতিলে ফেলতে চায়। বাবুর্চি লাথি মেরে বিড়ালকে সরিয়ে দেয়। বিড়াল কোন ভাবেই বাবুর্চিকে বুঝাতে পারল না।

খানকার মুরীদ ও মেহমানগণ খেতে বসলেন, এখন তাদের প্লেটে ডাল দেয়া হবে। তাঁরা ঐ ডাল খেয়ে হয়তঃ মারা যাবেন। বিড়াল বিচলিত ও অস্থির, হায়! কি করি, ছুটাছুটি করছে আর ম্যাঁও ম্যাঁও করছে । এখন ডাল বণ্টন হবে, হায়! বুঝাতেই পারলাম না, এ ডাল খেয়েতো মেহমানগণ মারা যাবেন। এ অবস্থায় বিড়াল কিছু করতে না পেরে এবং কোন উপায় না দেখে লোকগুলোকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সকলের সামনে লাফ দিয়ে ঝোপ

করে গরম ডালের পাতিলে পড়ে মারা যায়। বিড়াল মারা যাওয়া ডালতো আর কেউ খাবে না, ডাল ফেলে দিতে গিয়ে দেখে বিরাট একটি সাপ মরে আছে। এখন বুঝে এসেছে বিড়াল এতক্ষণ এমন করছিল কেন।

একটু ভাবুন! বিড়ালটি নিজের জীবন দিয়ে খানকাবাসীকে বাঁচিয়ে দিল কেন? জীবন দেয়া এত সহজ? সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিড়াল তার জীবন দিয়ে দিল কী কারণে? কারণ, এই খানকাবাসীর ভালবাসা আর মহব্বত বিড়ালের অন্তরে ঘর বেঁধে আছে। ঐ ভালবাসার কারণেই বিড়ালের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সহজ হয়ে গেছে। প্রকৃত বন্ধুর জন্যই বন্ধু জীবন দিতে পারে।

اے دوست اگر جاں طلبی جاں بتو بخشم

از جان چہ عزیز ست بگو آں بتو بخشم

বন্ধু! যদি জীবন চাও, জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

এর থেকেও যদি আরো কোন বস্তু তোমার প্রিয় হয়ে থাকে, বল!

তাও তোমার জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

কারণ মহাব্বতের দরুন কঠিনতম কাজ সহজ তর হয়ে যায়।

از محبت تلخہا شیریں شود

وز محبت رنجہا راحت بود

ভালবাসার দরুন তিক্ত বস্তুও মিষ্টি হয়ে যায়

ভালবাসার কারণে কষ্টও আরামে পরিণত হয়।

عشق کی دشواریوں نے کر دیا کامل مجھے

اب کوئی مشکل نظر آتا نہیں مشکل مجھے

প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাকে পূর্ণতা দান করেছে

এখন আর কোন কঠিন আমার দৃষ্টিতে কঠিন রয়নি।

ফরহাদ ও শিরীনের কাহিনী

ফরহাদ নামক এক যুবক শিরীন নামক এক যুবতীকে ভালবাসত। শিরীন ফরহাদকে বলছেঃ আমাকে পেতে হলে সাগর সেচতে হবে। কোন বিলম্ব না করে ফরহাদ এক দৌঁড়ে সাগরের কূলে পৌঁছে। সেখানে পৌঁছে দেখে কি দিয়ে সেচবে, হাতে করে তো কিছুই আনেনি, সাগরের কোলে একটি ঝিনুক পেয়ে তা দিয়ে সেচা আরম্ভ করে দেয়। আমরা হলে বলতামঃ সাগর সেচা কি আদৌ সম্ভব? কিন্তু ফরহাদের নিকট এ কাজ অসম্ভব নয়। তাও আবার ঝিনুক দিয়ে। কারণ, আমাদের অন্তরে শিরীনের ভালবাসা নেই, তাই আমাদের জন্য কঠিন। আর ফরহাদের অন্তরে শিরিনের ভালবাসা আছে, তাই তার কাছে সাগর সেচাও সহজ।

তেমনিভাবে বিড়ালের অন্তরে খানকাবাসীর ভালবাসা আছে বিধায় তার জন্য জীবন দিয়ে দেয়া সহজ হয়ে গেছে। ভালবাসা না থাকলে সম্ভব হতো না। খানকাবাসী মারা গেলে বিড়ালের কি ক্ষতি হতো? নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে কেন তাদেরকে বাঁচিয়ে দিল? এর একমাত্র কারণ তাদের মহব্বত আর ভালবাসা বিড়ালকে বাধ্য করেছে জীবন বিলিয়ে দিতে।

اے دوست اگر جاں طلبی جاں بتو بخشم
از جاں چہ عزیز ست بگو آں بتو بخشم

সে হয়তঃ ভাবছে, বিড়াল! তুই মারা গেলে কার কি আসবে আর যাবে? এই খানকাবাসী জীবিত থাকলে দ্বীনের উপকার হবে, আল্লাহ পাকের বান্দাদের উপকার হবে, অনেক লাভ হবে। মহব্বত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی ہے
بھڑک اٹھتی ہے یہ آتش کہ بھڑکائی نہیں جاتی

মহব্বত করা যায় না, মহব্বত হয়ে যায়
এ আগুন জ্বালাতে হয় না, এমনিতেই জ্বলে উঠে।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যম হয়ে এই উপাধি সকলের অন্তরে আসে যে, যখন একটি ছেলে মাদরাসায় ভর্তি হবে তখন তাকে তোমরা সকলে 'তালিবে ইলম' অর্থাৎ ইলম অন্বেষণকারী, জ্ঞান অন্বেষণকারী উপাধিতে ভূষিত করবে।

মুন্‌শী

কিছুদিন অতিক্রম হওয়ার পর এ তালিবে ইল্‌ম ছেলেটিকে সবাই 'মুনশী' বলে। কি অর্থ মুনশীর? মুনশী কেন বলে?

'মুনশী' (منشي) বাবুল ইফ'আল থেকে ইসমুল ফায়িল এর ছীগাহ তথা কর্তাবাচক শব্দ। এর অর্থ দু'টি। এক অর্থ হলঃ লেখক, মুনশী মানে লেখক। যে লেখে তাকে লেখক বলে। যে লিখতে জানে সে মূর্খ না শিক্ষিত? শিক্ষিত। তার মানে জগতবাসী এ ছেলেটিকে শিক্ষিত বলছে, যে আপনি লেখক তথা শিক্ষিত।

একটি প্রশ্ন

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এ রকম লেখা তো অন্য লাইনের ছেলেরাও লিখে, তাকে কেন 'মুনশী' বলা হয় না? এর উত্তর ঐ ছেলে থেকেই নেয়া হোক না? তাকে মুনশী বলে দেখুন না? সে লাঠি হাতে নিবে আর বলবেঃ চাচা মিয়া! আপনি আমাকে মুনশী বলছেন? দেখেন না, আমি কি মুনশী? এ ছেলেটাও তো লেখে কিন্তু মুনশী উপাধিটি গ্রহণ করতে রাজী নয়। কেন রাজী নয়? সে যেন বলছেঃ আমার লেখা তো বাম দিক থেকে শুরু হয়, বামের কোন দাম আছে? এটিতো লেখা নয়, বরং আঁক-উঁক মাত্র, তাই আমাকে মুনশী তথা লেখক বলা ভুল হবে, অতএব আমাকে মুনশী বলবেন না। মুনশীতো তারা, যারা মাদরাসায় পড়ে। কেন? তারা যে আরবী লেখে, যা ডান দিক থেকে শুরু হয়। অতএব, যে ঐ লেখা লিখবে তাকে মুনশী বলবেন, আমাকে নয়।

কেউ হয়ত বলবেন, হুযূররা বাংলা ভাষার বিরোধী, না... হুযূররা বাংলা ভাষার বিরোধী নয়। বাস্তব কথা বলছি, বাস্তবে যারা বাংলা ভাষার জন্য মায়া কাঁদা কাঁদে, তাদের অনেকে বাংলা বলতে পারে না, তাদের সন্তানরাও বাংলা বলতে পারে না। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, আবার গৌরবও করে যে, আমার ছেলে বা মেয়ে বাংলা বলতেই পারে না, ইংরেজিতে কথা বলে। তাদেরকে কি বলবেন? তাদেরকেই তো বাংলাভাষা বিরোধী বলতে হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা ভাষা আন্দোলন

১৩৫৯ বাং ৮ই ফাল্গুন, এ দেশে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। আফসোস! তা পালন হয় একুশে ফেব্রুয়ারি!!! এ আন্দোলন বাংলা ভাষার জন্য হয়েছে, না ইংরেজি ভাষার জন্য? যারা এ আন্দোলনে জীবন দিলেন তারা ইংরেজি ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন, না বাংলা ভাষার জন্য? তাহলে শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিতে কেন উদযাপন করা হয়? আমাদের কি বাংলা মাস নেই? বাংলা তারিখ নেই? এই ভাষার জন্য যারা রক্ত দিলেন, জীবন দিলেন তাদের কোন দাম নেই? এই ভাষার কোন মূল্য নেই।

৮ই ফাল্গুনের জায়গায় ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস উত্থাপন করা হচ্ছে! কত মায়া কাঁদা কাঁদছে! বাস্তবতো এই যে, এরাই ভাষা বিদ্রোহী, ঠিক কি না? যারা ভাষার জন্য জীবন দিলেন তাদের কবরে গিয়ে কখনো দু'আ-কালাম পড়েছে? বিভিন্ন জায়গায় শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে গিয়ে ফুল দেয়। দুই পয়সার লাভ হবে? আর যদি সুরা ফাতিহা, দু'আ-দুরূদ পড়তো তাহলে লাভ হতো, কবরবাসীরা শান্তি পেত, উপকৃত হতো। দু'আ-দুরূদের ধারে কাছে নেই, ঢোল-তবলা নিয়ে নাচানাচি করছে অথবা পাঁচ মিনিট নিরবতা অবলম্বন করছে, কি লাভ হবে?

বলতে গেলে বলবেন, হুযূর! আপনি পাগলের প্রলাপ বকছেন? আপনারাই বলুন, যারা এ ধরণের কথা বলে তাদের সন্তানরা বাংলা বলতে

পারেনা, ইংরেজিতে কথা বলে। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করে বহু ছেলে আমার সামনে আছে, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে না, ইংরেজিতে কথা বলে। তাহলে হুযূররা ভাষাবিদ্রোহী হলো, না তারা ভাষাবিদ্রোহী হলো? বাচ্চাকে নিজের মায়ের ভাষা শিখালাম না, ব্রিটিশদের ভাষা ইংরেজি শিখালাম, যারা প্রায় দুইশত বছর আমাদেরকে শোষণ করেছে, আমাদের উপর জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছে, আমাদের হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে, আর আমি ভাষার জন্য মায়া কাঁদা কাঁদছি। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফুল দিয়ে আসি শহীদ মিনারে, আমি শহীদের হিতাকাঙ্খী? দোষ হুযূরদের। তারা বাংলা ভাষার বিরোধিতা করে। দেখলেন তো বাস্তবে বিরোধিতা কারা করছে।

যাই হোক, সে বলছে: আমার এ লেখা লেখা নয়, আঁকাআঁকি মাত্র। অতএব আমাকে মুনশী বললে ভুল হবে, মিথ্যা হবে, আমাকে মুনশী বলবেন না। কওমী মাদরাসায় যে লিখছে ঐ লেখা ডান দিক থেকে শুরু হয়, ঐ লেখাই বাস্তবে লেখা। অতএব তাকে মুনশী তথা লেখক বলবেন।

মুনশী-মৌলভীগণ নেআমতের অসীলা

মুনশীর ২য় অর্থ হলোঃ পালনকর্তা। مجازى তথা রূপক অর্থ, পালনকর্তা। মুনশী আবার পালনকর্তা হয় কিভাবে? বাস্তবে পালনকর্তাতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। নিঃসন্দেহে পালনকর্তা আল্লাহ পাক কিন্তু আমাদের থাকা-খাওয়া, সুখ-শান্তি উপভোগ করা ইত্যাদি সবকিছুর অসীলা হলো এই মুনশী-মৌলভী। তাই রূপক অর্থে তাদেরকেও মুনশী তথা পালনকর্তা বলা হয়। হাদীস শরীফে আছেঃ

عن جابر -رضى الله عنه-، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم: معلِّم الخير يَستغفرُ له كلُّ شيء حتىَّ الحِيتانِ في البِحار.[19] وعن أبي أُمامةَ -رضى الله عنه-،

---

[19] أخرجه الترمذي في سننه، ٢: ٩٧، رقم الحديث: ٢٦٨٢، و قال في اخره: لا نعرف هذا الحديث الا من هذا الوجه، و الطبراني فى المعجم الأوسط مرفوعاً عن جابر-رضي الله تعالى عنه-، ٢١٤/٦، رقم

قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم: إِنَّ الله وملائكتَه وأهلَ السَّموات والأرضين حتىَّ النَّملةِ في جُحْرِها وحتىَّ الحوتِ في البَحر لَيُصلُّون على معلِّم النَّاسِ الخيرَ.[২০]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করেন আর ফেরেশতাগণ, আসমানবাসী, যমিনবাসী সহ জগতের প্রত্যেকটি মাখলূক এমনকি পানির নিচের মাছ,[21] গর্তের ভিতরের পিপীলিকা পর্যন্ত এই মুনশী-মৌলভীদের জন্য ক্ষমা চায় ও দু'আ করে ।[22]

কেন দু'আ করে? এরা বুঝে যে, আমাদের থাকা-খাওয়া, সুখ-শান্তি সব কিছুর চাবিকাঠি হলো এরা । তাই এদের জন্য দু'আ করা আমাদের সকলের কর্তব্য । কিভাবে এরা সকলের থাকা-খাওয়া ও সুখ-শান্তির অসীলা হলো? হাদীস শরীফে আছেঃ

الحديث : ٦٢١٩ ، وقال في آخره : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو إسحاق الفزاري . و أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ، كتاب العلم ، ٢- باب منه ، ١: ٣٣٢-٣٣٣ ، رقم الحديث : ٥١٢ ، عن الطبراني ، وقال : فيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة ، وثَّقه ابن حبان ، وقال الأزدي : منكر الحديث ، ولا يُلتفت إلى قول الأزدي في مثله ، وبقية رجاله رجال الصَّحيح . قال الشيخ محمد عوامة في التعليق على المصنف لابن أبي شيبة (٣٣٤/١٣) : فقد روي مرفوعا من حديث جابر ، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن . (معصوم بالله.)

[20] أخرجه الترمذي في سننه ، باب فضل الفقه على العبادة ، ٢: ٩٨ ، رقم الحديث : ٢٦٨٥ ، و قال في اخره : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح ، و في نسخة : هذا حديث غريب ، و الطبراني في المعجم الكبير ، ٢٣٤/٨ ، رقم الحديث : ٧٩١٢ ، و أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب العلم ، ٢- باب منه ، ١: ٣٣٣، رقم الحديث: ٥١٣ ، وقال في آخره : وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وثَّقه البخاريّ وضعَّفه أحمد. (معصوم بالله.)

[21] সুনানে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৯৭, হাদীস নং ২৬৮২, আল-মু'জামুল আওসাত, খ. ৬, পৃ. ২১৪, হাদীস নং ৬২১৯, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১, পৃ. ৩২৩-৩৩৩, হাদীস নং ৫১২ (মা'সূম বিল্লাহ)

[২০] সুনানে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৯৮, হাদীস নং ২৬৮৫, আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং ৭৯১২, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং ৫১৩ (মা'সূম বিল্লাহ)

لا تَقُوْمُ السَّاعةُ حَتیّ لا يُقالَ فِی الأَرضِ اللهُ اللهُ[٢٣]

অর্থ- যমীনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা একটি মানুষও যে পর্যন্ত জীবিত থাকবে সে পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না।[24]

কেয়ামতকে ঠেকিয়ে রেখেছে 'আল্লাহ আল্লাহ' বলনেওয়ালা মানুষটি। কিয়ামত না আসলেই তো আমাদের জন্য আল্লাহ পাকের নিআমত, সুখ-শান্তি সবই চলতে থাকবে। কিয়ামত আসলেইতো পার্থিব জগতের নিআমত, সুখ-শান্তি ইত্যাদি সব বন্ধ হয়ে যাবে। বলুন! 'আল্লাহ আল্লাহ' নামটি এ জগতে কে জিন্দা রেখেছে? মুনশী-মৌলভীরা নয় কি?

মৌলভীরাই ইসলামটাকে খাইছে!

একদিন বাসে এক ভদ্র লোক আমার সাথে তর্ক করে বললেনঃ হুযূর! "মৌলভীরাই ইসলামটাকে খাইছে", আমি বললামঃ ভাই! খেয়ে দেয়ে শেষ করে ফেলেছে, নাকি কিছু বাকী রেখেছে? তিনি উত্তর দিলেনঃ "না রাখলে কি আর আমরা মুসলমান থাকতাম?" আমি বললাম, তো রেখেছে কারা? খাইলতো মৌলভীরা, রাখলো কারা? তিনি বললেন, "হুযূর! সত্য কথা বললেতো বলতে হয়, রেখেছেও মৌলভীরাই।" আমি বললামঃ রেখেছে মৌলভীরা তো খেয়েছেও তারা, দোষ করল কী? যে রাখে সেইতো খায়। জিলাপীওয়ালা জিলাপী বিক্রি করতে এসেছে, আপনি এক পোয়া জিলাপী ক্রয় করেছেন। খাবে কে? আপনি না আমি? আপনি কিনেছেন, আপনি খাবেন। আমাকে এক-দু'টো দিলে খেতে পারি, না দিলে আমার কিছু করার আছে? যেহেতু জিলাপী আপনি রেখেছেন, তাই

---

[23] أخرجه مسلم فی صحيحه، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان فی آخر الزمان، ١: ٨٤، رقم الحديث: ٣٧٣ ، و ابن حبان في صحيحه ، ١٥ / ٢٦٣ ، رقم الحديث : ٦٨٤٩ ، و أحمد في مسنده ، ١٠٧/٣ ، رقم الحديث : ١٢٠٦٦ (١٢٠٤٣). (معصوم بالله.)

[24] সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৩৭৩ , মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ১২০৬৬ (মা'সূম বিল্লাহ)

জিলাপী আপনার, খাওয়ার অধিকারও আপনার। আপনার রাখা জিলাপী আপনি খেয়েছেন, দোষের কি হলো? এবার বলুন, ইসলাম যখন রেখেছে মৌলভীরা, খাইলও মৌলভীরা, দোষের কি করলো? আপনারা রাখতে পারলেন না, খেতেও পারলেন না। মধ্যখানে অপরাধ মৌলভীদের?

এই মোল্লা-মৌলভীরাই তো ইসলামকে টিকিয়ে রেখেছে। তাদের অসীলায়ই আল্লাহ পাকের নাম জিন্দা আছে। তা না হলেতো এই কায়েনাত (জগত) ধ্বংস হয়ে কবে কিয়ামত সংঘটিত হতো। এ জন্য এদেরেকে বলা হয় "মুনশী" মানে তোমরাই আমাদের পালনকর্তা, তোমাদের অসীলায় আমরা খাই, তোমাদের অসীলায় আমরা সুখ-শান্তি উপভোগ করি। অতএব তোমরা "মুনশী"।

একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত

একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটি বুঝতে চেষ্টা করি।

জমিদার বাড়ীতে আপনার ছেলের বিয়ে

ধরুন! জমিদার সাহেবের মেয়ের সাথে আপনার ছেলের বিয়ে ঠিক করেছেন। কাল বিয়ে হবে। আজ রাত থেকেই জমিদার সাহেব গরু জবাই আরম্ভ করেছেন। ডজন খানেক গরু জবাই করেছেন। গরু জবাই দেখে জমিদার বাড়ীর কুকুরগুলো সারা গ্রামের কুকুরদেরকে নিয়ে আনন্দ মিছিল বের করেছে। ঘেউ ঘেউ করছে রাতভর। কি আনন্দ? কি খুশী? এক দৌঁড়ে বাড়ীর এই মাথায়, আরেক দৌঁড়ে বাড়ীর ঐ মাথায়। মনে হয় যেন আগামীকাল এদেরই বিয়ে হবে। এরপর বিরিয়ানী তৈরি হলো। আপনার ছেলে কিছু মেহমান নিয়ে জমিদার বাড়ী উপস্থিত হলো। খাবার পরিবেশন করা হলো, সকলেই পেট ভরে খেল। দস্তরখান যখন ঝাড়ছে (পরিস্কার করছে) বাড়ীর কিনারায় খাবারের এক বিশাল স্তুপ জমা হয়ে গেছে। সেখানে কুকুরের ভীড় জমেছে, মজা করে খাচ্ছে। সবচেয়ে বড় ভাগ কুকুরের হয়েছে। আর দুলা মিয়া খেলো তো নাই উপরন্তু একখানা

রুমাল ভাজ করে মুখের ছিদ্র বন্ধ করে বসে আছে। খাবার যে ঢুকাবে সে ছিদ্রটিও বন্ধ করে রেখেছে।

এ অবস্থা দেখে এক লোক জমিদার সাহেবের কাছে গিয়ে বলছেঃ জমিদার সাহেব! এতোগুলো গরু জবাই করেছেন কেন? কি উদ্দেশ্য? জমিদার সাহেব উত্তর দিলেন, বুঝেন না? দুলামিয়ার উদ্দেশ্যে জবাই করেছি। সে বললোঃ দুলা তো একজন, সে এতগুলো গরুর গোশত খেতে পারবে? দুলার উদ্দেশ্যে হলে বাজার থেকে এক পোয়া গোশত কিনে নিয়ে এলেই তো যথেষ্ট হতো। এতগুলো গরু জবাই করার কি দরকার ছিল? আমিতো দেখছি আপনি এতগুলো গরু জবাই করেছেন কুকুরের জন্য। জমিদার সাহেব বললেন, তুমি কি বলছো? কেউ কি কোন দিন কুকুরের জন্য গরু জবাই করে? সে বললঃ হ্যাঁ... আমিতো দেখছি, কুকুরের ভাগটাই সবচেয়ে বড়। ওরা সবাই পেট ভর্তি করে খাচ্ছে। দুলাতো দু-চারটি লোকমাও খায়নি। জমিদার সাহেব বললেনঃ বেয়াক্কল! আমি বুঝি না? এক ডজন গরুর গোশত দুলা খেতে পারবে না। দুলা কি আজ এ বাড়ীতে খেতে এসেছে? দুলা আজ এ বাড়ীতে খেতে আসেনি। দুলার উদ্দেশ্য হলো আরেকটি স্পেশাল নিআমত। ঐ স্পেশাল নিআমতটি হলো আমার মেয়ে। দুলা অপেক্ষায় আছে, ঐ স্পেশাল নিআমতটি কখন তার সামনে আসবে। বাসর ঘর কখন শুরু হবে। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি দুলার ভ্রুক্ষেপ থাকবে কি করে? সে তো ঐ স্পেশাল নিআমতের অপেক্ষায় আছে, ঐ চিন্তায়ই মগ্ন। দুলাকে কেন্দ্র করেই এক ডজন গরুর গলায় ছুরি চালিয়েছি, আমি আগেই জানতাম দুলার সাথের মেহমান আর কুকুরগোষ্ঠি পেট বোঝাই করে খাবে। আমি এও জানতাম যে, কুকুরের ভাগটাই সবচেয়ে বড় হবে।

লোকটা বললোঃ তাহলে এক ডজন গরু কেন জবাই করেছেন? জমিদার সাহেব জবাব দেনঃ এতগুলো গরু জবাই করেছি দুলার শান আর ইজ্জত রক্ষার্থে, কুকুরের জন্য নয়। এক ডজন গরু যদি জবাই না করতাম তাহলে দুলার ইজ্জত থাকত না। তার সম্মান রক্ষার্থে আমি এক ডজন গরুর গলায় ছুরি চালিয়েছি। যদি মাত্র এক পোয়া গোশত আনতাম,

তাহলে ওর সাথী-সঙ্গীরা ওকে ধিক্কার দিত আর বলতঃ এমন কানজুশ আর বখীলের বাড়ীতে বিয়ে করতে এসেছ? একটি গরুও জবাই করতে পারলো না। এ জন্য গরুগুলো জবাই করেছি। ঠিক নয় কি? উদ্দেশ্য তো দুলাই, তাকে অসীলা করে সবাই পেট বোঝাই করছে। বিশ্বাস না করলে দুলা কে বাদ দিয়ে আসলেই দেখা যাবে, খাবারের পরিবর্তে হয়ত জুতা আসবে গালে।

তেমনিভাবে মাওলায়ে পাক যেন বলছেনঃ ও জগতবাসীরা! জেনে রেখো, বিশ্বের সাড়ে ছয়শ' কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র এক দেড় লক্ষ হবে মুনশী-মৌলভী, আর এই এক দেড় লক্ষ মুনশী-মৌলভীরা আমার দৃষ্টিতে দুলা মিয়া। এদের লক্ষ্যেই আমি এ বিশাল কায়েনাত তথা সৃষ্টি জগত এবং বিশ কোটি বর্গমাইলের এ পৃথিবী সাজিয়ে রেখেছি। আমি মাওলা এ কথা বুঝি যে, একটি থানা কিংবা থানার অর্ধেক এদের জন্য যথেষ্ট হবে, তারপরও এ বিশাল দুনিয়া কেন সাজিয়ে রাখলাম? আমার দুলা মিয়াদের শান ও ইজ্জত রক্ষার্থে।

আর এই মুনশী-মৌলভীরাও ভাল করে বুঝে যে, এই দুনিয়ার চাকচিক্য, রং-ঢং আর ধন-সম্পদ তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদেরকে অসীলা করে জগতের কুকুরের গোষ্ঠি তথা আমার দুশমনেরা পেট বোঝাই করে খাবে। আমি মাওলা এ কথা আগে থেকেই বুঝতাম যে, দুলা মিয়া এদিকে তাকাবে না, ভ্রুক্ষেপও করবে না। কারণ দুলামিয়া বুঝে ওদের যে, এ জগতে আসা একটি স্পেশাল নিআমত অর্জনের লক্ষ্যে। সে নিআমত হলো আখেরাতে আমার দীদার আর সাক্ষাত। কখন দীদার হবে, কখন সাক্ষাত হবে, দুলা মিয়া সর্বদা এই চিন্তায় মগ্ন থাকে।

মৃত্যু আনন্দের ব্যাপার, আতংকের কারণ নয়

মৃত্যু কোন ভয় ও আতংকের বস্তু নয়, বরং খুশির বিষয়। কারণ, মাওলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারছিনা হায়াতের বাধার কারণেইতো। এ বাধা সরে গেলে মৃত্যু আসলেইতো সাক্ষাতের সুযোগ হবে। যা আসলে

বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হবে তা আবার আতংকের কারণ হয় কি করে? বরং তাতো হবে অনেক আনন্দের ব্যাপার।

আজ থেকে প্রায় সাতশ' বছর আগের একজন বুযুর্গ হযরত হাফেয সীরাযী রহ.। তাঁকে সবসময় চিন্তিত দেখা যায়, হাসি-খুশী করতে দেখা যায় না। একদিন প্রশ্ন করা হলো হুযূর! পেটে কোন ব্যথা আছে? উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ, ব্যথা আছে, তবে পেটে নয়, অন্তরে। কিসের ব্যথা? মাওলার বিচ্ছেদের ব্যথা, খুশি তো ঐ দিন হব যে দিন মৃত্যু আসবে।

তাঁর ভাষায় বলছেনঃ

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم
راحت جاں طلبم وز پئے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسر ایں دم روزے
تا در میکدہ شادان و غزل خواں بروم

ঐ দিন হবে আমার খুশির দিন,
যেদিন এ জগত ছেড়ে চলে যাব।
ঐ দিন মনের আনন্দে গজল গাইতে গাইতে
বন্ধুর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে উড়ে চলব।

মুনশী-মৌলভীরাতো এ 'দীদার' নামক নিআমতের অপেক্ষায় আছেন। এ জগতের রং-ঢং এবং পার্থিব চাকচিক্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। এরা দুই-তিন হাজার টাকা বেতনে মাদরাসায় পড়ে রয়েছে। তাও কয়েক মাস ধরে বাকী থাকে। একটি পানের বাক্স বুকে নিয়ে ঘুরলেও মাসে দশ হাজার টাকা উপার্জন করা যায়।

এরা কি ল্যাংড়া? এরা কি লুলা? এরা কি অবুঝ? এরা বুঝে না? সব বুঝে। তারপরও কেন পড়ে রয়েছে? উদ্দেশ্য তো এ জগত নয় বরং সেই স্পেশাল নিআমত। আর তা হলো দীদারে খোদা তথা মাওলার সাক্ষাত। কিন্তু এ কোটি কোটি নিআমত তাদেরকে লক্ষ্য করেই এবং তাদের অসীলায়ই মাওলা পাক সৃষ্টি করে রেখেছেন।

মাদরাসায় চাঁদার প্রয়োজন হয় কেন?

প্রশ্ন করতে পারেন যে, হুযূর! উল্টো কথা বলছেন। কোথায় এদের অসীলায় আমরা খাই? বরং আমরা চাঁদা দিয়ে এদেরকে খাওয়াই। তা না হলে মাদরাসায় চাঁদা দেয়া ও নেয়া হয় কেন?

উত্তর ঃ

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রশ্নটির উত্তর বুঝার চেষ্টা করুন। দেখুন! দুলার সামনে স্পেশাল একটি প্লেট দেয়া হয়। এতে আস্ত ভাজি মুরগী, কয়েকটি ভাজি ডিম, আরও কত কিছু দিয়ে প্লেটটি সাজানো থাকে। দুলা বসে আছে কিন্ত খায় না, কিছুক্ষণ পর শালা-সম্বন্ধী দু'চারজন এসে সামনে বসে দুলার ঐ প্লেট থেকে খেয়ে পেট বোঝাই করে। ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি লোকমা দুলার মুখে জোর করে ঠেলে দেয়। এখন যদি তারা মনে করে যে, আমাদের অসীলায় দুলা খাচ্ছে, আমরা যদি দুলাকে না খাওয়াতাম তাহলে দুলা ক্ষুধায় মরতো। তাদের এ ধারণা সঠিক হবে? ভুল হবে, বরং দুলার অসীলায় এরা খেতে পেরেছে, এ বাড়ীতে দুলা না আসলে এরা এ ধরণের খানা খেতে পারত? পারত না।

এরা দুলার মুখে দু'চারটি লোকমা কেন ঠেলে দিল? তারা এ কাজ দ্বারা বুঝাতে চায় যে, ও দুলা ভাই! আমরা আপনার দূরের কেউ নই, আমরা আপনার নিকটতম আত্মীয়। এ পরিচয় দেয়ার লক্ষ্যে আমরা আপনার সামনে এসে দু'চারটি লোকমা ফাঁকে ফাঁকে আপনার মুখে ঠেলে দিচ্ছি। অতএব, যখন পিকনিকে যাবেন, পার্কে ঘুরতে যাবেন আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে হবে, ভুলে গেলে চলবে না। ঐ পরিচয় দেয়ার লক্ষ্যে দু'চারটি লোকমা আপনার মুখে ঠেলে দিলাম।

তেমনিভাবে ভালো ভালো মানুষগুলো দু'চার শত বা দু'চার হাজার টাকা মাদরাসায় নিয়ে আসে আর এ কথা বুঝাতে চায় যে, আপনারা আমাদের দুলা ভাইতুল্য এ জগতের মধ্যমণি। আমরা আপনাদের নিকটতম মানুষ! আপনাদের সাথে আমাদের আন্তরিকতা ও ভালবাসা

আছে। এ পরিচয়টি দেয়ার লক্ষ্যে দু'চার শত বা দু'চার হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে গেলাম। মানে আপনাদের মুখে দু'চারটা লোকমা ঠেলে দিলাম। অতএব কাল আখেরাতে যখন পিকনিকে যাবেন, বেহেশত নামক পার্কে ঘুরতে যাবেন তখন আমাদেরকে ভুলে গেলে হবে না, আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। উদ্দেশ্য হলো এটা।

শালা-সম্বন্ধীরা দুলার মুখে দু'চারটি লোকমা ঠেলে দেয়, এ লোকমাগুলো তাদের কষ্টার্জিত নয়। তাদের বাপের তৈরিকৃত খাবার। মধ্যখানে উপকৃত হচ্ছে তারা, পার্কে যাওয়ার সুবিধা ভোগ করছে তারা।

তেমনিভাবে ভাল মানুষেরা মাদরাসায় চাঁদা দিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাকের দেয়া সম্পদ দিয়ে যাচ্ছে। নিজের কিছু দিচ্ছে না। মধ্যখানে ফায়দা লুটছে নিজেরা। বেহেস্তে যাওয়ার সুবিধা ভোগ করছে।

বুঝা গেল, মাদরাসায় চাঁদাদাতারা মাদরাসা চালায় না। বরং চাঁদাদাতাসহ সকলেই মাদরাসা ও আলেম-উলামাদের অসীলায় চলে ও খায়। মাদরাসা তো আল্লাহ পাকই চালান।

বাদশাহর হুকুমঃ হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার দরবারে নযর-নিয়ায পেশ করা নিষেধ

হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া রহ. এর দরবারে হাজার হাজার মানুষ থাকে ও খায়। হিংসুটেরা তৎকালীন বাদশাহর কাছে গিয়ে বলেছে যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত বাদশাহ্ তো নিযামুদ্দীন। বাদশাহ বললোঃ কিভাবে? তারা বললোঃ নিযামুদ্দীন যদি আজকে দাবী করে যে, আমি এ দেশের বাদশাহ্, তাহলে সে বাদশাহ্ হয়ে যাবে। কেননা সকলের অন্তরে তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়েছে। তাঁর দরাবারে লক্ষ-লক্ষ মানুষ আসছে আর খাচ্ছে। ফলে আপনার বাদশাহী আর থাকবে না। বাদশাহ্ জানতে চাইল তাহলে এখন কি করতে পারি? তারা বাদশাহ্কে পরামর্শ দিল, নিযামুদ্দীন এর দরবারে যে হাদিয়া-তোহফা আর নযরানা আসে তা বন্ধ করে দিন। বাদশাহ্ আইন করে দিল যে, নিযামুদ্দীনের দরবারে সর্বপ্রকার হাদিয়া-তোহফা ও নযরানা পেশ করা নিষেধ। বাদশাহ পাহারাদার নিযুক্ত করে

রেখেছেন কেউ কোন হাদিয়া-তোহফা আনে কিনা? ওরা ভাবছে, হাদিয়া-তোহফা বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ আর খাওয়া-দাওয়া পাবে না। সবাই তার দরবার ছেড়ে চলে যাবে। ফলে নিযামুদ্দীন পঙ্গু হয়ে পড়বে।

এই সংবাদ যখন হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া শুনতে পেলেন তখন লংগরখানার নাযিম তথা দায়িত্বশীলকে ডেকে বললেনঃ ভাই! আজ থেকে আগের তুলনায় দ্বিগুণ খাবার পাক করবে। এরপর থেকে পাক-সাক ডবল চলছে, আর মানুষও ডবল আসছে। হাদিয়া-তোহফা ও নযরানা আসা একেবারে বন্ধ। এত খানা কোত্থেকে আসে, কেউ জানে না। বাদশাহ্ তো এদিকে লোক লাগিয়ে রেখেছেন। বাদশাহ্র কানে এ খবর পৌঁছল যে, হাদিয়া-তোহফা সব বন্ধ কিন্তু পাক হচ্ছে ডবল। আর মানুষও আসছে দ্বিগুন। বাদশাহ্ ছিলেন হুশিয়ার ও বুদ্ধিমান। তার বুঝে এসে গেছে যে, এর সাথে টক্কর দেয়া যাবে না। কারণ এরা আমাদের মত নয়, এদের অবস্থা হলোঃ

کارسازما بفکر کارماست
فکرما درکارما آزارماست

আমাদের থাকা-খাওয়া ও পরার চিন্তা তো আমাদের
পালনকর্তার, আমাদের নিজের নয়। এ নিয়ে চিন্তা করতে গেলে
পেরেশানী ও অস্থিরতা বাড়বে। লাভ কিছুই হবে না।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. ও তৎকালীন বাদশাহ্র কথোপকথন

হযরত সুফিয়ান সাওরীকে রহ. (৯৭-১৬১ হি. / ৭১৬-৭৭৮ ঈ.) একদিন তৎকালীন বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ভাই সুফিয়ান! চাকরী-বাকরীও তো করতে দেখি না, ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে দেখি না, খাও কোথা থেকে? তখন সুফিয়ান সাওরী রহ. জবাব দিলেনঃ ভাই! তুমি তো দেখি বড় বেয়াকুফ! বাদশাহ্ বললেনঃ কী বেয়াকুফী করলাম? সুফিয়ান সাওরী রহ. বললেনঃ তোমার প্রশ্ন বলছে তুমি বড় বেয়াকুফ। বাদশাহ্

জানতে চাইলেনঃ ভাই! কিভাবে বেয়াকুফ হলাম? সুফিয়ান রহ. বললেনঃ আমি যার গোলাম, আমার চিন্তা তো তার যিম্মায়। তিনি কোত্থেকে খাওয়ান-পরান তাকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?

চাল ও আটার কল চাল-আটা বের করার জন্য এতো ধান ও গম কোথায় পায়? চাল কলের নীচ দিয়ে চাল পড়ে। আটার কলের নীচ দিয়ে আটা পড়ে। উপরে থাকে একটি চুঙ্গি। চুঙ্গিতে ধান ঢাললে নিচ দিয়ে চাল বের হয়, আর গম ঢাললে নীচ দিয়ে আটা বের হয়। এখন যদি কেউ কলকে জিজ্ঞেস করে, ও কল! এতো চাল-আটা বের করছ, এতো ধান ও গম কোত্থেকে পাও? তখন কল এ কথা বলবে না? যে, তুমি বড় বেয়াকুফ। এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? আমার মালিককে জিজ্ঞেস কর। আমার মালিক যদি উপর দিয়ে ধান ঢালে তাহলে আমি নীচ দিয়ে চাল বের করি। আর যদি আমার উপর দিয়ে গম ঢালে তাহলে আমি নীচ দিয়ে আটা বের করি। আমার দায়িত্ব হলো: মালিক আমার উপর দিয়ে যা দিবে তা চূর্ণ করে নীচ দিয়ে বের করে দেয়া। আর যদি কিছু না দেয় কিছু বের না করা। আমার মালিক জানে কোত্থেকে চুঙ্গিতে ধান দিবে আর কোত্থেকে গম দিবে। সেটা আমি জানি না।

হযরত সুফিয়ান রহ. বুঝাতে চান, ও বাদশাহ! আমিও তো কলের ন্যায়। মালিক যদি আমার মুখ দিয়ে রুটি আর ভাত ঢুকান তাহলে আমি মল-মূত্র নীচ দিয়ে বের করে দেই। আর মালিক যদি না ঢুকান তাহলে কিছু বের হবে না। কোত্থেকে ঢুকবে আমার মুখে ভাত বা রুটি? তা আমি জানি না। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? মালিককে জিজ্ঞেস কর। মালিকের প্রশ্ন আমাকে করা কি বেয়াকুফী নয়? বাদশাহ মাথা নত করে ফেললেন।

হুযূররা পরখাউয়া!

আরেকটি কথা ভাল করে বুঝে নেই। না বুঝে আমরা অনেকে বলিঃ "হুযূররা পরখাউয়া"। হুযূরদেরকে গালি দেই। আহ! বুঝ-বুদ্ধির অভাব! হুযূরদেরকে দাওয়াত দিয়েই তো খাওয়ান! না হুযূররা আপনার ঘরে জোর

করে এসে খেয়ে যায়? কোন হুযূর জোর করে আপনার ভাতের পাতিল কেড়ে নিয়েছে কখনো? দেখাতে পারবেন? দাওয়াত দিয়েই তো খাওয়ান? দাওয়াত কাদেরকে দেয়া হয়? শত্রুকে দেয়া হয়, না মিত্রকে? দুশমনকে দেয়া হয়, না বন্ধুকে? যার জন্য আন্তরিকতা আছে, ভালোবাসা আছে, মহব্বত আছে এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে তাকেই তো দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয়। যার জন্য মহব্বত আছে সে পর, না আপন? হুযুরদের মহব্বত আপনার অন্তরে আছে বিধায়ই তো তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াচ্ছেন। তাহলে হুযূররা আপন ঘরে খেলেন না পরের ঘরে? এবার বলুন, হুযূররা পরখাউয়া হলেন? না আপনখাউয়া? কারা পরখাউয়া আর কারা আপনখাউয়া একটু ভেবে দেখুন!

বাস্তবে হুযূররা আপনখাউয়া আর সকলেই পরখাউয়া

ডাক্তার

ডাক্তারের নিকট রুগী যায়। ডাক্তার বলছেঃ পেট কাটা লাগবে। পেট কাটা হল এবং বিল করা হল পঞ্চাশ হাজার টাকা। কত কাকুতি-মিনতি করে কোন রকম ত্রিশ হজার দিয়ে সেরে এসেছেন। ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এসে বলছেনঃ ডাক্তার কিসের! কসাই! কসাই! এক ঘন্টা সময়ও লাগেনি, ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে গেল। ডাকাত! অপারেশন না করলেও চলত। টাকার জন্য অপারেশন করেছে। ডাক্তারকে খুশী হয়ে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছেন? নাকি টাকা দিতে কলিজা ছিড়ে গেছে? ডাক্তারকে তো পয়সাগুলো মহব্বত করে দেননি, আন্তরিকতার সঙ্গে দেননি, আপন মনে করে দেননি, মনের চাহিদার বিরুদ্ধে দিয়েছেন। এই ত্রিশ হাজার টাকা তথা রুগীর ভিজিট খেয়েই তো ডাক্তার বাঁচতেছে। তাহলে ডাক্তার পরখাউয়া হলো, নাকি আপনখাউয়া হল? পরখাউয়াই হল। তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ডাক্তার পরখাউয়া।

ইঞ্জিনিয়ার

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাড়ীর মাস্টার প্লান তৈরি করল। বিল করল পঞ্চাশ হাজার টাকা। আপনি বলছেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! এত টাকা? বিলটি একটু কমিয়ে ধরুন! দশ হাজার টাকা কমিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা করল। এ টাকা দিতে তো আপনার কলিজা ছিড়ে যায়। এরপরও চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে আসছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একটি কাগজে প্লান এঁকে দিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে গেল। আপনি কলিজা ছিড়া অবস্থায় দিলেন। আর বলছেন, কি ডাকাতি! একটি নকশা এঁকে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে গেল! এ টাকাগুলো ইঞ্জিনিয়ারকে আপন মনে করে দিয়েছেন? নাকি পর মনে করে দিয়েছেন? পর মনে করে দিয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার যে আপনার এই টাকা খেয়ে বাঁচতেছে সে পরখাউয়া হলো না?

সরকারী চাকুরিজীবী

সরকারী চাকুরিজীবী যারা, তারা বলতে পারেনঃ আমরা আপনখাউয়া। বুঝুন, বুঝতে চেষ্টা করুন। সরকার যে চাকুরিজীবীদেরকে বেতন দেয়, এ টাকা সরকার নিজে বানায়, না আমার-আপনার টাকা? বিভিন্ন ধরণের ট্যাক্স, ভ্যাট, আয়কর, শিক্ষাকর, এই কর-সেই কর ইত্যাদি উসুল করেই তো বেতন দিচ্ছে। এই করের টাকাগুলো আপনারা বড় খুশি হয়ে দেন? নাকি বড় মসীবতে পড়ে দেন? না হয় অফিসে ঘুষ-মুষ দিয়ে ট্যাক্স কমানোর চেষ্টা করেন কেন? ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া হয় কেন? এরপরও বলে বেড়ান যে, এ সরকার একেবারে জালিম সরকার। কর এত বেশি ধরেছে, জুলুম করেছে, এ সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাও, বেশি খেতে চায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ট্যাক্স যে দিলেন তা খুশী হয়ে দিলেন না বেজার হয়ে দিলেন? বেজার হয়ে দিলেন। এভাবে জোর-জবরদস্তি করে টাকা নিয়ে গেল সরকার, যা আপনি বেজার হয়ে দিলেন। সে টাকা দিয়েই তো বেতন দিল। ট্যাক্স আপন ভেবে দিয়েছেন? না পর ভেবে? এই টাকাগুলো দিয়ে

সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেয়া হলো। তাহলে এখন সরকারী চাকুরিজীবীরা আপনখাউয়া হলো? না পরখাউয়া? পরখাউয়া হলো।

তাহলে এ কথা পরিস্কার হয়ে গেল যে, সকল ডিপার্মেন্টের লোকেরা পরখাউয়া। একমাত্র আপনখাউয়া হলো মৌলভীরা। কারণ মহব্বতের কারণেই তো দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন। কিন্তু উল্টো এদেরকেই বলা হচ্ছে পরখাউয়া।

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

جو چاہے ترے حسن کرشمہ ساز کرے

জ্ঞানের নাম পাগলামি আর পাগলামির

নাম জ্ঞান রাখা হচ্ছে, যা ইচ্ছা তাই কর।

আসুন! আসল কথায়; মুনশী-মৌলভীর অসীলায় খেয়ে বাঁচলাম। এ জন্য জগতবাসী এদেরকে মুনশী বলে। না হয়, পরামর্শ-মিটিং করে কেউ কখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি যে, এদেরকে মুনশী বলা হোক। কোন মৌলভীও তো বলেননি যে, আমাদেরকে মুনশী বলা হোক। বলা ছাড়াই বলছে যে, আপনাদের অসীলায় আমরা খাই। অতএব আপনারা মুনশী তথা রুপক অর্থে পালনকর্তা।

মৌলভী

আরো কিছুদিন গেলে এদেরকে বলে 'মৌলভী' (مولوي)। কী অর্থ 'মৌলভী'র? কেন মৌলভী বলে এদেরকে? মৌলভী একটি আরবী শব্দ। এর শেষে যে 'ইয়া' আছে একে (ياء نسبتي) বা সম্পর্ক সূচক ইয়া বলে। ফলে মৌলভী অর্থ হলঃ মাওলার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি, অর্থাৎ মাওলার সাথে যার সম্পর্ক আছে তাকে বলে মৌলভী (مولوي)অর্থাৎ আল্লাহওয়ালা। হিন্দু-খ্রিস্টানও তো মৌলভীকে মৌলভীই বলে। তার মানে: জাতি-বিজাতি সবাই মিলে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনি আল্লাহওয়ালা।

মাওলানা

আরো কিছুদিন গেলে বলে 'মাওলানা'। কী অর্থ 'মাওলানার'? কেন বলে মাওলানা? মাওলানা (مولانا) একটি আরবী শব্দ। এ শব্দটি দু'টি অংশে গঠিত। একটি হল 'মাওলা' (مولى) আর অপরটি হলঃ 'না' (نا)। মাওলার দুই অর্থ; এক অর্থ-'মালিক'। আরেক অর্থ-বন্ধু। ([illegible]) অর্থ-আমাদের। সুতরাং 'মাওলানা' অর্থ- "আমাদের মালিক ও আমাদের বন্ধু।" কেন এই উপাধি তাকে দিল? কারণ হলোঃ সকলেই যেন বলছেঃ আপনি একমাত্র শিক্ষা অন্বেষণকারী 'তালিবুল ইলম' (طالبِ العلم), আপনি একমাত্র জ্ঞান অন্বেষণকারী (طالبِ العلم)। আপনি একমাত্র লেখক আর শিক্ষিত তথা 'মুনশী' (منشي)। আপনার অসীলায় আমরা খেয়ে-দেয়ে বাঁচি, সুখ-শান্তি উপভোগ করি। অতএব, আপনি মুনশী (منشي)। আপনি একমাত্র আল্লাহওয়ালা 'মৌলভী' (مولوي)। যে লোকটি এত গুণে গুণান্বিত, তার সাথে আমাদের ভালবাসা হবে না তো আর কার সাথে হবে? এ জন্য আমরা সকলে আপনাকে বন্ধু মনে করে আপনাকে 'মাওলানা' তথা 'আমাদের বন্ধু' বলতে বাধ্য। আপনি আমাদের বন্ধু।

আপনার অসীলায় আমরা খাই, আপনার অসীলায় আমরা থাকি, আপনার অসীলায় আমরা সুখ-শান্তি উপভোগ করি। অতএব, আপনি আমাদের মালিক তথা 'মাওলানা'। আর আমরা সকলেই আপনার গোলাম।

আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মাওলানা বলা কি জায়েয?

একটি প্রশ্নঃ আজকাল আবার কারো কারো তাওহীদের অর্থাৎ একত্ববাদের হায়যা তথা ডায়রিয়া হয়েছে। তারা বলেঃ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মাওলানা বলা জায়েয নেই, কারণ মালিক একমাত্র আল্লাহই, আর কেউ নন।

উত্তরঃ এরা কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ, এরা কুরআন পড়ে না, বুঝেও না। আল্লাহ পাক কুরআনেই আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে নবীর মাওলা বলেছেনঃ

فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ- নিঃসন্দেহে আল্লাহ, জিবরীল ও নেককার মুমিনগণ তার (নবীর) মাওলা।[25]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেকে মাওলানা বলার পাশাপাশি হযরত জিবরাঈল (আ.) কে মাওলানা বলেছেন, নেককার মুমিনদেরকেও মাওলানা বলেছেন। অতএব আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে 'মাওলা' কিংবা 'মাওলানা' বলা কুরআনের ভাষ্যনুযায়ী নাজায়েয নয়।

মোল্লা

আরো কিছুদিন গেলে বলে 'মোল্লা' (ملا)। কেন বলে মোল্লা, কী অর্থ এই মোল্লার? অভিধান খুলে দেখুন, 'মোল্লা' তুর্কিস্তানী শব্দ। 'মোল্লা' ঐ সমস্ত মহামানবদেরকে বলা হয়, যারা যুগশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, যুগের সেরা জ্ঞানী এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষিত। এ জন্য মোল্লা আলী ক্বারী রহ., মোল্লা হিফজুর রহমান সিউহারবী রহ., মোল্লা নিযামুদ্দীন রহ., মোল্লা জালাল রহ., মোল্লা মুহাম্মাদ কাশ্মীরী রহ. ও মোল্লা জামী রহ. প্রমুখদেরকে মোল্লা বলা হয়। কেননা তাঁরা তদানিন্তন যুগের শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ছিলেন, যুগের সেরা জ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, আমরা জগতবাসী সব মুর্খের দল, আমরা জগতবাসী সব অশিক্ষিতের দল, জ্ঞানী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও মহাপণ্ডিত একমাত্র আপনারা। এজন্য আমরা সকলে আপনাদেরকে 'মোল্লা' উপাধিতে ভূষিত করলাম।

---

[25] সূরা আত্-তাহরীম, ৬৬ : ৪

বাদশাহ্ আকবরের একটি ঘটনা

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী রহ. আল-ইবকায় একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, বাদশাহ্ আকবর তার প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে একদিন বিকেলে ঘুরতে বের হয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক পুকুরের পাড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পুকুর পাড়ে গিয়ে বাদশাহ্ আকবর তার প্রধানমন্ত্রী বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ও বীরবল! বলোতো এ পুকুরে কত পেয়ালা পানি হবে? বীরবল জবাব দেয়, বাদশাহ্ জাহাঁপনা! পেয়ালায় পানি ধরে এক ছটাক আর দুই ছটাক, এত বড় পুকুর, এ পুকুরে কত পেয়ালা পানি হবে অনুমান করা কি আদৌ সম্ভব?

এর মধ্যেই দেখা গেল একজন নাবালেগ মোল্লা তালিবে ইলম (طالبِ العلم) আসছে। বাদশাহ্ তাকে ডেকে বললেনঃ ও মোল্লা! বলোতো! এ পুকুরে কত পেয়ালা পানি হবে? শোনা মাত্রই সে উত্তর দিলঃ বাদশাহ্! যে পেয়ালা দিয়ে মাপ দিবেন ঐ পেয়ালাটি যদি পুকুরের সমান সমান হয় তাহলে এক পেয়ালা পানি হবে। পেয়ালা যদি পুকুরের অর্ধেক হয় তাহলে দুই পেয়ালা পানি হবে আর পেয়ালা যদি পুকুরের চার ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে চার পেয়ালা পানি হবে। এভাবে সে হিসাব দিয়েই চলছে। বাদশাহ্ বললেনঃ ও মোল্লা! থামো। অতঃপর বীরবলকে লক্ষ্য করে বললেনঃ ও বীরবল! এ মোল্লা যদি আজ প্রাপ্তবয়স্ক হতো তাহলে তোমাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব তাকে দিয়ে দিতাম। এই হলো 'মোল্লা' তথা বাস্তব বুদ্ধিমান।

বাদশাহ্ আকবরের নবরত্ন ও মোল্লা দুপেয়াজা

বাদশাহ্ আকবরের দরবারে নয়জন বুদ্ধিজীবী থাকতো। এদেরকে নবরত্ন বলা হতো। দরবারে একজন মোল্লাও থাকতেন। মোল্লা দুপেয়াজা আর নয়জন বুদ্ধিজীবী ছিলেন ননমোল্লা। একদিন বাদশাহর দরবারে কথা উঠলো, দেশে ডাক্তার বেশি না রুগী বেশি? সকলেই বললো রুগী বেশি ডাক্তার কম, বাদশাহ্ও এ মত পোষণ করলেন। কিন্তু মোল্লা দুপেয়াজা

বলছেনঃ না... দেশে ডাক্তার বেশি, রুগী কম। সবাই বললোঃ বাদশাহ্! দেখলেনতো? এ মোল্লাদের কাজই উল্টা-পাল্টা কথা বলা। প্রমাণ দিতে বলুন, কিভাবে ডাক্তার বেশি আর রুগী কম হলো। বাদশাহ্ বললেনঃ মোল্লা! প্রমাণ দাও। মোল্লা দুপেয়াজা বললেনঃ প্রমাণ দিব আগামীকাল। তাকে বলা হল, আজ দিলে ক্ষতি কী? তিনি বললেনঃ তাও বুঝে আসবে আগামীকাল। বাদশাহ্ বললেনঃ ঠিক আছে, আগামীকাল সূর্যাস্তের আগে আগে যদি প্রমাণ দিতে না পার তাহলে তোমার গর্দান যাবে। মোল্লা বললেনঃ ঠিক আছে। মজলিস সমাপ্ত হলো।

সকলে আগামীকালের অপেক্ষায় আছে। নয়রত্ন মনে মনে খুশি, দেশে ডাক্তার কম, রুগী বেশি, তা কে না জানে। মোল্লা কোত্থেকে প্রমাণ দিবে। কালকে মোল্লার গর্দান যাবে। মোল্লার ঝামেলা থেকে আগামীকাল মুক্তি পাব। সবাই দরবারে উপস্থিত, মোল্লার নিধনলিলা দেখতে। বাদশাহ্ও উপস্থিত, সবাই অপেক্ষমান, মোল্লা কি জবাব দেয় দেখবে, কিন্তু মোল্লা অনুপস্থিত, মোল্লার কোন খবর নেই, সকলেই অপেক্ষা করছে, সূর্য লাল হয়ে গেছে, মোল্লার নাম-নিশানাও নেই। সবাই বললোঃ বাদশাহ্! দেখলেনতো মোল্লার অবস্থা। পারবে না প্রমাণ দিতে, না হয় গতকাল প্রমাণ দিতে কি সমস্যা ছিল? সে বাঁচার জন্য বাহানা দিয়ে পালিয়ে গেছে কোনো রকমে। মোল্লা আর আসবে না। পাইক পেয়াদা পাঠান, মোল্লাকে ধরে আনা হোক।

সূর্য লাল হয়ে গেছে, অস্ত যাওয়ার সময় অল্প বাকী। দূরে দেখা যাচ্ছে মনে হয় মোল্লা আসতেছে। মোল্লা সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে কোন রকম এসে দরবারে উপস্থিত হল। রুমাল দিয়ে মোল্লার চেহারা ও গাল বাঁধা। মোল্লাকে দেখে সকলেই বলে উঠলোঃ মোল্লা! প্রমাণ পরে দিও, এত দেরী কেন করেছ? এর কৈফিয়ত আগে দাও। মোল্লা বললেন, ভাইয়েরা! আমি যে আসতে পেরেছি এটাইতো গনীমত, আমি দাঁতের ব্যথায় অস্থির। ওয়াদা করে গিয়েছি বিধায় ওয়াদা পালন করার জন্য এসেছি, না হলে আমার আসাটাই বড় কঠিন ছিল। আমি দাঁতের ব্যথায় অস্থির। শুনা মাত্রই-

❖ বাদশাহ্ বললেনঃ আরে! গরম পানি দিয়ে কুলি করলেইতো ব্যথা কমে যেত।
❖ প্রধানমন্ত্রী বীরবল বললঃ লবণ লাগালেতো ব্যথা কমে যেত।
❖ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললঃ আরে! একটু সাদা (তামাক) পাতা লাগিয়ে রাখলেইতো ব্যথা কমে যেত।
❖ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললোঃ গুল দিয়ে দাঁত মাজলেও ব্যথা কমে যেত।
❖ অর্থমন্ত্রী বললঃ কচি আমপাতা চিবালেইতো ব্যথা কমতো।
❖ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বললঃ কচি পেয়ারা পাতা চিবালেও ব্যথা কমে যেত।
❖ বনমন্ত্রী বললঃ আমলকী চিবালেও ব্যথা কমে।
❖ শিক্ষামন্ত্রী বললঃ গরম সেক দিলেও ব্যথা কমে।
❖ পশুমন্ত্রী বললঃ আদা দিয়ে পান খেলেও ব্যথা কমে।
❖ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললঃ দাঁতটি উঠিয়ে ফেললেও ব্যথা কমে যেত।

নয় রত্নের নয় চিকিৎসা আর বাদশাহ্র এক চিকিৎসা, মোট দশজনে দশ চিকিৎসা দিল। এবার মোল্লা রুমাল খুলে স্ট্রং দাঁড়িয়ে বলছেনঃ রুগী আমি একজন আর ডাক্তার আপনারা দশজন। এখন সবার মাথা নিচের দিকে। জাতি এদেরকে মোল্লা এমনিতেই বলে? জ্ঞানের কারণেই বলে।

এক বুদ্ধিজীবীর লজ্জাকর ঘটনা

ঘটনাটি বাস্তবের সাথে মিল নাও থাকতে পারে তবে বিষয়বস্তু বুঝার জন্য অনেক সহায়ক হবে বলে উল্লেখ করছি। ঘটনাটি হলোঃ

কোর্টে এক মোল্লা তার আসামীর পক্ষে ওকালতী করতে চাইলে অন্যান্য উকীলগণ বাধা প্রদান করে ও বলেঃ মোল্লা সাহেব ওকালতীর যোগ্যতা রাখেন না। তিনি ওকালতী পড়েননি, তাঁর কাছে কোন সার্টিফিকেট নেই। অতএব তিনি ওকালতী করলে আদালত অবমাননা হবে। কিন্তু মোল্লা সাহেবের চাহিদা ও দাবীর প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছিল যে, হাকিম সাহেব অনুমতি দিয়েই দিবেন। এ অবস্থা দেখে একজন বড় আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী বললেনঃ আমি মোল্লা সাহেবকে কিছু প্রশ্ন করছি।

যদি তিনি এ প্রশ্নগুলোর উত্তর শুধু 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দিয়ে দিতে সক্ষম হন তাহলে বুঝা যাবে, তিনি একজন জ্ঞানী মানুষ, তখন তাকে ওকালতীর অনুমতি দেয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়। মোল্লা সাহেব বললেনঃ সব সময় সব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দিয়ে দেয়া যায় না। বুদ্ধিজীবী বললেনঃ দেয়া যায়, বাকী আপনি যদি না পারেন তাহলে তা হবে আপনার অযোগ্যতা। অতএব আপনি ওকালতী করতে পারবেন না। তখন মোল্লা সাহেব বললেনঃ আপনি কি সকল প্রশ্নের উত্তর শুধু 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দিয়ে দিতে সক্ষম? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, সক্ষম। মোল্লা সাহেব বললেনঃ যদি সক্ষম না হন? বুদ্ধিজীবী বললেনঃ যদি সক্ষম না হই তাহলে কান ধরে কোর্ট থেকে বের হয়ে যাব। জীবনে আর কোন দিন ওকালতী করতে কোর্টের ছায়ায় আসব না। মোল্লা সাহেব বললেনঃ তাহলে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, আপনি 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দিয়ে এর উত্তর দিন। বুদ্ধিজীবী বললেনঃ প্রশ্ন করুন, আমি 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দিয়ে উত্তর দিচ্ছি। মোল্লা সাহেব প্রশ্ন করলেনঃ জনাব! আপনার আব্বাজানের নাকি মসজিদে মসজিদে গিয়ে মুসল্লীদের জুতা চুরি করার অভ্যাস ছিল, তাঁর এ অভ্যাসটি কি এখনো আছে, নাকি ছেড়ে দিয়েছেন? তখন বুদ্ধিজীবী বিপাকে পড়ে গেলেন, 'হ্যাঁ' বললে; পুরোনো জুতা চোরের ছেলে প্রমাণিত হবেন আর 'না' বললে তাজা জুতা চোরের ছেলে প্রমাণিত হন। আর জুতা চোরের ছেলে ওকালতী করছে কোন্ লজ্জায়? অবশেষে মোল্লা সাহেবের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে আরম্ভ করে।

হাকিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেনঃ উকীল সাহেব! লজ্জা পেলেন নাকি? উকীল সাহেব বলছেনঃ না, লজ্জা পাইনি। তবে বিশ বছর আগে আমি একটি হাদীস পড়ে অট্টহাসি দিয়েছিলাম, হাদীস নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলাম। আজ এ মোল্লা সাহেবের অসীলায় ঐ হাদীসটি বুঝে এসেছে, তাই কাঁদছি। কী সেই হাদীস? বুদ্ধিজীবী বললেনঃ হাদীসটি ছিল, "যখন সবচাইতে বড় কোর্ট অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ হাশর মাঠে। যে কোর্টের হাকিম হবেন স্বয়ং আল্লাহ পাক সে কোর্টের ওকালতী করবে নাকি এ মোল্লারা। তারা ওকালতী ও সুপারিশ করে নাকি হাজার হাজার জাহান্নামী মানুষকে

জান্নাতে নিয়ে যাবে" ।[26] এ হাদীস পড়ে আমি ব্যঙ্গ করেছিলাম যে, এরা কখনও ল' পড়েনি । কোর্টে এসে ওকালতীর প্রাক্টিস করেনি, এরা কিভাবে আবার সবচেয়ে বড় কোর্টের ওকালতী করবে? আজ এ মোল্লার সাথে ওয়াস্তা পড়ার দরুণ বুঝতে পেরেছি যে, ওকালতী করতে পারলে মোল্লারাই পারবে । তাই চোখের পানি পড়ছে ।

হযরত ও হুযূর

এর কিছুদিন পর মোল্লাদেরকে বলে 'হযরত' বা 'হুযূর' । কেন এদেরকে হযরত বা হুযূর (حضرت ، حضور) বলে? উলামায়ে কিরামগণ বুঝবেন, 'হুযূর' তো মাছদার (مصدر) , 'হযরত' হাসেলে মাছদার (حاصل مصدر) । 'হুযূর' মানে "উপস্থিত হওয়া" আর 'হযরত' মানে 'উপস্থিত' । কোথায় এরা উপস্থিত? কোথায় উপস্থিত হয়? জগতবাসী এ কথা বুঝাতে চায় যে, আপনি একমাত্র জ্ঞান অন্বেষণকারী, ইলম তালাশ করনেওয়ালা তাই আপনি 'তালিবে ইলম' । আপনি একমাত্র লেখক আর শিক্ষিত তাই আপনি 'মুনশী' । আপনার অসীলায় আমরা খাই, সুখ-শান্তি উপভোগ করি, তাই আপনি 'মুনশী' । আপনি একমাত্র আল্লাহওয়ালা তাই আপনি 'মৌলভী' । আপনার আন্তরিকতা আর মহব্বত আমাদের অন্তরে আছে

---

[26] عن عثمان بن عفان-رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء . أخرجه ابن ماجه في سننه ، باب ذكر الشفاعة ، ٢ : ٣٢٠ ، رقم الحديث : ٤٤٥٦ ، و إسناده شديد الضعف ، فيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك الحديث ، و أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ، باب فيمن يشفع من الانبياء و غيرهم ، ١٠ : ٦٩٢ ، و قال في آخره : قلت : رواه ابن ماجة باختصار المؤذنين ، رواه البزار ، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن الأموي ، وهو مجمع على ضعفه .و السيوطي فى الجامع الصغير ، ٦ : ٥٩٧ ، رقم الحديث : ١٠٠١. (معصوم بالله.)

সুনানে ইবনে মাজাহ, খ.২, পৃ. ৩২০, হাদীস নং ৪৪৫৬, আল জামিউস সগীর [ফয়যুল কাদীর সংযুক্ত], খ.৬, পৃ.৫৯৭, হাদীস নং ১০০১১ (মা'সূম বিল্লাহ)

তাই আপনি 'মাওলানা'। আপনি আমাদের মালিক, তাই আপনাকে 'মাওলানা' বলি। একমাত্র আপনি মহাজ্ঞানের মালিক, আপনি 'বুদ্ধিমান', যুগের সেরা শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তথা আপনি 'মোল্লা'। এ জন্য আপনার ভালবাসা আর মহব্বত আমাদের অন্তরে এমনভাবে ঘর বেঁধে আছে, মনে হয় যেন সব সময় আমরা আপনাকে আমাদের অন্তরে উপস্থিত পাই। আমাদের দিলের ভিতরে যেন আপনি বসে আছেন। ঐ ভালবাসার ফল হিসেবে আমরা আপনাকে 'হুযূর' বা 'হযরত' বলতে বাধ্য যে, আপনি সব সময় আমাদের দিলে উপস্থিত, এ জন্যই আপনাকে বলি 'হুযূর'। না হয় কেউ কোন দিন পরামর্শ করে এ কথা বলেনি এবং সিদ্ধান্ত নেয়নি যে, এদেরকে 'হুযূর' কিংবা 'হযরত' বলতে হবে। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যম হয়ে সকলের অন্তরে এসেছে যে, এদেরকে 'তালিবে ইলম', 'মুনশী', 'মৌলভী', 'মাওলানা', 'মোল্লা', 'হুযূর' ও 'হযরত' বলতে হবে। আল্লাহু আকবার!

এক বুদ্ধিজীবীর আশ্চর্য বুদ্ধি

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশে আমরা যাদেরকে বুদ্ধিজীবী বলে থাকি তাদের মধ্যে প্রথম সারির একজন বুদ্ধিজীবী ড. আহমাদ শরীফ। তার একটি লেখা একবার পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তিনি লিখেছেনঃ "ইসলাম মূর্খের ধর্ম, এ ধর্ম থেকে শেখার কিছুই নেই"। (নাউযুবিল্লাহ) এ দাবীর স্বপক্ষে তিনি দু'টি যুক্তি তুলে ধরেছেনঃ

১. ইসলামের মূল হল কুরআন। আর কুরআন শুরু হয়েছে 'সূরা বাকারাহ' দিয়ে। 'বাকারাহ' মানে গাভী। গাভী দিয়ে যে কুরআন শুরু হয় এ থেকে শেখার কী আছে?

২. ইসলামের প্রথম মানুষ আবূ বকর। 'আবূ' মানে বাপ আর 'বকর' মানে বলদ। আবূ বকর মানে বলদের বাপ।

যে ইসলামের কিতাব শুরু হয় গাভী দিয়ে আর মানুষ শুরু হয় বলদের বাপ দিয়ে। এই ইসলাম থেকে কী শেখার আছে?

মাদরাসার ছোট একটি ছাত্র এবং আপনারাও বলতে পারবেনঃ হে বুদ্ধিজীবী! আপনার পদস্খলন ঘটেছে। কুরআনের প্রথম সূরা সূরা বাকারাহ নয় বরং 'সূরা ফাতিহা'। যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নেয়া হয় যে, সূরা ফাতিহা কুরআনের ভূমিকা, বাকারাহ দিয়েই কুরআন শুরু হয়েছে। তাহলে শুনুন!

'সূরা বাকারাহ' নামকরণ

এই সূরার নাম কেন "বাকারাহ" হলো তার কারণ সূরার ভিতরেই উল্লেখ আছে। কুরআনের ভিতরে ঢুকা তো কপালে জুটেনি, কারণ বুঝবে কোত্থেকে? এই সূরার মধ্যে একটি বিশেষ গাভীর আলোচনা আছে, যার কারণে এই সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা বাকারাহ'।

বনী ইসরাঈলের এক যুবকের বিয়ের প্রস্তাব ও মেয়ের পিতাকে হত্যা

ঘটনাটি হলোঃ বনী ইসরাঈলের[27] এক যুবক এক যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। নিয়ম হলোঃ কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণ করা না করা তার ইচ্ছাধীন থাকে। এ হিসেবে মেয়ের পিতা উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ছেলে জিদ করে যে, জোরপূর্বক হলেও ঐ মেয়েকে বিয়ে করবেই। তাই সে তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাতের অন্ধকারে মেয়ের পিতাকে হত্যা করে ফেলে। কারণ তার ধারণা মতে, মেয়ের পিতাই এ বিয়ের সবচেয়ে বড় বাধা।

এখান থেকে একটি কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, বিনা অপরাধে মানুষ খুন করা অর্থাৎ মানবাধিকার লঙ্ঘন করা ইহুদী-খৃষ্টানদের পুরোনো অভ্যাস। তেমনিভাবে মেয়ে সম্মত না থাকলেও তাকে জোরপূর্বক বিয়ে

---

[27] ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে পবিত্র কুরআনে একসাথে 'বনী ইসরাঈল' বলে। (মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন)

করা অর্থাৎ নারী স্বাধীনতা হরণ করা ইহুদী খৃষ্টানদের পুরোনো অভ্যাস, মুসলমানদের নয়।

হত্যার পর যুবক বাঁচার জন্য লাশ নিয়ে রাস্তায় এসে চিৎকার আরম্ভ করে যে, আমাদের এই লোকটিকে কে হত্যা করেছে? আমি তার বিচার চাই।

দেখুন, ঘাতক নিজেই বিচার চায়! ইহুদী-খৃষ্টানরা কত বড় ধোকাবাজ! লোকেরা দেখতে পেলো যে, একজন লোককে হত্যা করা হয়েছে, বিচার হওয়া দরকার কিন্তু এর কোন সাক্ষী নেই। তাকে কে হত্যা করেছে কেউ দেখেনি। বিচার হবে কিভাবে?

তখন হযরত মূসা (আ.) জীবিত ছিলেন। তারা মূসা (আ.) এর নিকট গিয়ে আরয করল, হুযূর! এ লোকের ঘাতক কে? তাকে ধরিয়ে দিন। মূসা (আ.) তো আর গায়েব জানেন না, গায়েবের খবর তো একমাত্র আল্লাহই জানেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে যোগাযোগ করলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে বললেনঃ আপনি এদেরকে একটি গাভী জবাই করতে বলুন, তবেই ঘাতক ধরা পড়বে। আসলে কি তারা ঘাতক ধরতে চায়? মোটেও নয়। আল্লাহ পাক বলেনঃ "وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ" তারা করতে চাচ্ছিল না।[28] জাতির চোখে ধুলা দেয়ার জন্য পাঁয়তারা করেছে মাত্র। এজন্য তাদেরকে এ কথা বলার পর তারা বললঃ হে মূসা! তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? না হয় ঘাতক ধরার সাথে গাভী জবাই করার কী সম্পর্ক? মূসা (আ.) বললেনঃ আউযুবিল্লাহ... আমি ঠাট্টা করব কেন? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তাই বলেছি, ঠাট্টা করছি না। "أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ" অর্থ ঃ আল্লাহর পানাহ, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত নই।[29]

তারা তো গাভী জবাই করতে চায় না, তাই একটি বাহানা বের করেছে যে, আচ্ছা! যে গাভীটি জবাই করার কথা বলছেন তার বয়স কত

---

[28] সূরা আল-বাকারাহ, ২ ঃ ৭১

[29] সূরা আল-বাকারাহ, ২ ঃ ৬৭

হতে হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ মধ্যম বয়সের হতে হবে, একেবারে বুড়িও নয় আবার কচিও নয়। তারা আরেকটি বাহানা বের করলো ও বললোঃ আচ্ছা, গাভীটির রং কেমন হতে হবে? রং জানার তো কোন দরকার ছিল না, তবুও তাদের প্রশ্নের কারণে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ রং হতে হবে কড়া হলুদ ও এমন আকর্ষণীয় যার দিকে তাকালে চোখ জুড়ায় 'تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ'। তারা বললোঃ আরো কিছু চিহ্ন বলে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ গাভীটি এমন হতে হবে, যে কোন দিন লাঙ্গল টানেনি, কূপ থেকে পানি উঠানোর লক্ষ্যে জোঁয়াল কাঁধে নেয়নি। এমন একটি নিখুঁত গাভী হতে হবে। এরা বললঃ আচ্ছা! দেখি, এমন গাভী পাওয়া যায় কি না। তাদের ধারণা, এতো শর্ত সাপেক্ষে গাভী পাওয়া যাবে না। অতএব জবাইও করতে হবে না। ঘাতকও ধরা পড়বে না। কিন্তু যদি তালাশ না করা হয় তাহলে জাতি বলবেঃ তালাশ করলে না কেন? তোমরাই ঘাতক। কাজেই গাভী তালাশে বের হলো। বের হয়ে দেখে এক জায়গায় হুবহু এমন একটি গাভী। অতঃপর তারা মালিকের কাছে রওনা হলো।

এই ফাঁকে আল্লাহ তা'আলা গাভীর মালিকের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন এ বলে যে, তুমি গিয়ে মালিককে বলোঃ কিছু লোক তোমার গাভী ক্রয় করতে আসছে। তুমি যত দাম চাবে তাই পাবে। অতএব, দাম বেশি করে চাবে।

তারা গিয়ে দেখে একজন ছেলে এ গাভীর মালিক। তারা তাকে বলল, গাভীটি বিক্রি করে দাও। সে বলল, না... এটিতো আমার শখের গাভী, বিক্রির জন্য নয়। তারা বললঃ গাভীটি আমাদের খুব দরকার, বিক্রি করে দাও। অনেক পীড়াপীড়ির পর সে রাজী হলো। এবার দামের পালা। দাম জিজ্ঞেস করলো, বুদ্ধিতো শেখানোই আছে কিন্তু অনেক বেশি দাম যে চাইবে, এত বড় সংখ্যা তো তার জানা নেই। কারণ ঐ যুগেতো বড় সংখার গণনা ছিল না। তাই সে এভাবে দাম চাইল যে, আমার গাভীর চামড়া ছিলার পর তার চামড়ার মধ্যে যত সোনা-রুপা ধরবে তা হলো আমার গাভীর দাম। তারা বলল একটি গাভীর কি এত দাম হয়? সে

বললঃ না হলে বিক্রি করবো না। এখন দামের ভয়ে না কিনলে জাতি বলবেঃ তোমরাই ঘাতক। এ ভয়ে চাঁদা করে গাভীটি কিনে নিল।

মা-বাবার খিদমতের বরকত

এখানে বুঝার বিষয়, ঐ ছেলেকে আল্লাহ তা'আলা এ বুদ্ধি কেন শিখিয়ে দিলেন? এর কারণ হলো, তার পিতা ছিল না। আর মা ছিল অসহায়। সে ছোট হয়েও সাধ্যমত মায়ের সেবায় কোন ত্রুটি করেনি। আল্লাহ পাক মায়ের খেদমতের বরকতে একটি গাভীর বিনিময়ে তাকে কোটিপতি বানিয়ে দিলেন।

خدمت مادر پدر کن صبح وشام

تا بیابی ہر دو عالم نیک نام

সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ সবসময় মাতা-পিতার সেবা কর।
উভয় জাহানে সুনাম অর্জন করবে অর্থাৎ সফল হবে।

গাভী এনে জবাই করে তার একটি অংশ লাশের সাথে মিলানোর সাথে সাথে লাশ জিন্দা হয়ে গেল। লাশ জিন্দা হয়ে বললোঃ এ বিচার প্রার্থীই তো আমার ঘাতক। এ আমাকে রাতের আঁধারে হত্যা করেছে। ঘাতক ধরা পড়ে গেল। এ গাভীর কারণেই এ সূরার নাম "সূরা বাকারাহ" রাখা হয়েছে। اللہ اکبر

ইহুদী-খৃষ্টানদের বাস্তব রূপ

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কয়েক হাজার বছর আগের ইহুদী-খৃষ্টানের এক বিয়ের ঘটনা এবং গাভী জবাইয়ের মাধ্যমে ঘাতক ধরার ঘটনা আল্লাহ পাক আমাদেরকে কেন জানালেন? আমাদের এতে কী লাভ হলো? এ ঘটনা না জানলেই বা আমাদের কী ক্ষতি হতো?

এর উত্তর হলোঃ আল্লাহ পাক যেন বুঝাতে চান, ও আমার পছন্দের বান্দা মুসলমানরা! তোমাদের আশেপাশে দু'টি ধোকাবাজ জাতি বসবাস করবে। একটি জাতির নাম হবে ইহুদী, আর অপরটির নাম হবে খৃষ্টান। এদের স্বভাব হবে এই যে, অপরাধ করবে এরা নিজেরা আর দোষ চাপাবে তোমাদের ঘাড়ে। এই ধোকাবাজ জাতি থেকে সবসময় সতর্ক থাকবে।

পত্রিকায় দেখেননি? ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়। তিন হাজার ইহুদী সেখানে চাকরি করতো, একজনও সেদিন চাকরীতে আসেনি। বুঝতে কি আর বাকী থাকে, কারা এ কাজ করেছে? কিন্তু ভাঙ্গার পর এর দোষ চাপানো হলো কার ঘাড়ে? বললো আফগানিস্তানের পাহাড়ের গুহার মধ্যে উসামা বিন লাদেন নামে পাগড়ী পরিহিত এক ব্যক্তি থাকে সেই এ কাজ করেছে। তারা এ ধরণের দোষ চাপাবে এটা তাদের হাজার বছরের পুরোনো অভ্যাস। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার মাধ্যমে তাই জানিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় তো হলো! ওদের সুরে সুর মিলিয়ে কিছু মুসলমান এ কথা কি করে বলে যে, বিন লাদেনই এ কাজ করেছে? যদি কুরআন-হাদীস পড়তো তাহলে আর ওদের কথায় এভাবে ধোকা খেতো না। আল্লাহ পাক সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

বুদ্ধিজীবী ড. আহমাদ শরীফের দ্বিতীয় যুক্তি

বুদ্ধিজীবী জনাব আহমাদ শরীফ সাহেব দ্বিতীয় যুক্তি এভাবে পেশ করলেন যে, 'আবূ' মানেঃ বাপ, আর 'বকর' মানেঃ বলদ, আবূ বকর মানেঃ বলদের বাপ। আল-'আয়াযু বিল্লাহ! মাদরাসার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র উক্ত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির মাপ দিতে পারবে। যে 'বক্বর' (بقر) বড় ক্বফ অর্থাৎ দুই নোকতা ওয়ালা ক্বফ (□) দিয়ে লেখা হয়, তার অর্থ হয় "বলদ"। আর ছোট কাফ অর্থাৎ নোকতা বিহীন কাফ দিয়ে লিখলে তার অর্থ "বলদ" হয়

না। আবূ বকর (بكر) রাযি. এর বকর (بكر) ছোট কাফ (ك) দিয়ে লেখা হয়, বড় ক্বফ (ق) দিয়ে নয়।

অক্ষরের পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। আমাদের বাংলা ভাষায়ও এর উদাহরণ অনেক রয়েছে। যেমনঃ 'ভাত' এবং 'বাত' এর মধ্যে 'ভ' এবং 'ব' এর পরিবর্তনের কারণে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। 'ভাত' মানে এক প্রকার খাদ্য। আর 'বাত' মানে এক প্রকার রোগ। বাতে কোমর বাঁকা করে আর ভাতে কোমর সোজা করে। কত ব্যবধান! "বাবা" মানে পিতা আর "ভাবা" মানে চিন্তা করা। "পল" মানে- গাছের কাঁচা নরম অংশ যা ঘুনে খায়। আর "ফল" মানে- গাছ প্রভৃতিতে জন্মানো বা উৎপাদিত শস্য বা বীজাধার (আম, জাম ইত্যাদি) যা মানুষে খায়। কিন্তু বুদ্ধিজীবী সাহেব বড় ক্বফ (ق) ও ছোট কাফ (ك) এর পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হননি। ছোট ক্বাফের আবূ বকরকে বড় ক্বাফের আবূ বক্বরের অর্থ করে নিজের পরিচয়ই তুলে ধরলেন যে, তিনি কত বড় মাপের বুদ্ধিজীবী! আল্লহু আকবার!

آنکس کہ نداند وبداند کہ بداند

در جہل مرکب ابد الدہر بماند

যে জানে না অথচ মনে করে যে, সে জানে এমন ব্যক্তি
আজীবন ডবল মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে।

আবূ বকর নামের রহস্য

এবার বুঝার চেষ্টা করি যে, আবূ বকর নামের রহস্য কী? পূর্ব থেকেই তার নাম আবূ বকর হিসেবে কেন পরিচিতি লাভ করে? আবূ বকর নামের অর্থ কী? "আবূ" মানে পিতা, বাবা ও আব্বা, আর বকরের অর্থ তিনটিঃ

১. বকরের প্রথম অর্থ- প্রভাত ও ভোর বেলা।

২. বকরের দ্বিতীয় অর্থ- মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি ।

৩. বকরের তৃতীয় অর্থ- মৌসুমের প্রথম ফল ।

১. রাতের পর আসে "প্রভাত" । মানুষ রাতের অন্ধকারে ঘুমে বিভোর থাকে । রাতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে । ভোর এসে সকলকে জাগিয়ে তোলে । ভোরের আগমনে মানুষের মধ্যে নব জাগরণ সৃষ্টি হয় । মানুষ নতুন উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ে, ফলে উন্নতি আসে ।

আল্লাহ তা'আলা যেন বলছেনঃ হে আমার বান্দারা! শুনে রাখো; মানব জাতি কুফর ও শিরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো । আমার আবূ বকরের ত্যাগের কারণে তাদের মধ্যে ঈমানী নব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে । এ জন্য তাকে শুধু প্রভাত বললে মানাবে না, তাকে "আবূ বকর" তথা প্রভাতের 'আব্বা' বলতে হবে ।

২. মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির পূর্বে জমিন মরা থাকে, অনাবৃষ্টির কারণে জমিন ফেটে চৌচির হয়ে যায় । চতুর দিকে শুধু বালি আর বালি । গাছ-গাছালীও থাকে মৃত প্রায় । পাতাবিহীন অবস্থায় উলঙ্গ দাড়িয়ে থাকে । মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির কারণে জমিন নতুন জীবন লাভ করে । চতুর্দিক সবুজ-শ্যামল হয়ে যায় । বুঝুন! নতুন বৃষ্টির দাম কত!

আল্লাহ পাক যেন বুঝাতে চান, ঈমানের বৃষ্টি না থাকার দরুণ গোটা মানব জাতি কাফির-মুশরিক তথা মুর্দা ছিল । আমার আবূ বকরের ত্যাগ ও কুরবানীর কারণে ঈমানের সঞ্চার হয়ে মানব জমিন অর্থাৎ এই মানুষগুলো জিন্দা হয়েছে । এ জন্য আমার আবূ বকরকে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি বললে হবে না বরং মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির 'বাবা' বলতে হবে ।

৩. মৌসুমের প্রথম ফলকে বলা হয় বকর । মৌসুমের প্রথম ফলের দাম বেশি, স্বাদ বেশি এবং উপকারিতাও বেশি ।

আল্লাহ তা'আলা যেন বলছেনঃ ও জগতের মানুষ! আমার আবূ বকর হলো ইসলামী মৌসুমের প্রথম ফল । তিনিই প্রথম মুসলমান । এ জন্য তার দাম, স্বাদ ও উপকারিতা অনেক বেশি । তাই তাকে শুধু মৌসুমের প্রথম ফল বললে হবে না তাকে আবূ বকর তথা মৌসুমের প্রথম ফলের 'পিতা' বলতে হবে ।

আবূ বকর (রাযি.) এর মূল্য

আবূ বকর (রাযি.) [হি.পূর্ব: ৫১-১৩ হি.] এর দাম কত বেশি? তাঁর ফযীলত ও দাম সম্পর্কে শেখ সা’দী রহ. [৫৮০ হি. / ১১৮৪ ঈ.-৬৯১ হি. / ১২৯২ ঈ.] তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব গুলিস্তাঁ এর মধ্যে আলোচনা করেছেনঃ

گلی خشبوئے در حمام روزے ❖ رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشکے یا عبیری ❖ کہ از بوئے دلاویز تو مستم
بگفتہ من گلے ناچیز بودم ❖ ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال ہمنشین در من اثر کرد ❖ وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

একদিন আমার এক বন্ধু গোসল খানার ভিতরে আমাকে
সুঘ্রাণযুক্ত একটি মাটির ঢিলা হাদিয়া দেয়।
কি আশ্চর্য! জিজ্ঞেস করলামঃ ও মাটির ঢিলা!
তোমার থেকে তো গন্ধ আসার কথা, ঘ্রাণ আসছে কোত্থেকে?
তুমি কি মেশক না আম্বর? তোমার ঘ্রাণে তো আমি মোহিত।
মাটির ঢিলা জবাব দেয়ঃ হ্যাঁ, গন্ধইতো আসার কথা,
যেহেতু আমি মাটি। কিন্তু আমি কিছুদিন ফুলের বাগানে
ফুলের সংশ্রবে ছিলাম, ফুলের সাথে থাকার কারণে
আমার মধ্যে ফুলের প্রভাব বিস্তার করেছে বিধায়
আমার থেকে ঘ্রাণ পাচ্ছো, অন্যথায় গন্ধই পেতে।

এখানে বুঝার বিষয়, বন্ধু বন্ধুকে হাদিয়া দিলে মাটির ঢিলা দিবে? তাও আবার গোসলখানায়! হাদিয়া দেওয়ার আর কোন জায়গা ছিল না? আর মাটি হাজার বছর ফুল বাগানে থাকলেও তার থেকে সুঘ্রাণ আসার কথা? তদুপরি সে তো মানুষের মত কথা বলতে পারে না। তাহলে শেখ সা’দী রহ. কী বললেন? কার কথা বললেন?

এখানে ‘বন্ধু’ মানে- তাঁর শায়খ ও মুর্শিদ, শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরোয়ার্দী রহ. [৫৩৯-৬৩২ হি.]। ‘হাম্মাম’ তাদের পরিভাষায় আলমে

মালাকুত তথা উর্ধ্ব জগতকে বলে। 'মাটির ঢিলা' বলে হযরত আবূ বকর (রাযি.) কে বুঝিয়েছেন।

এবার বুঝুন! শেখ সা'দী রহ. এর এ কবিতা দ্বারা আসল উদ্দেশ্য কী? শেখ সা'দী রহ. বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমার পীর ও মুর্শিদ শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরোওয়ার্দী রহ. এর ফয়েয ও বরকত নিয়ে একবার আমি মোরাকাবায় বসি। মোরাকাবা অবস্থায় রূহানীভাবে আমি আলমে মালাকুত তথা উর্ধ্ব জগতে পৌঁছে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, লক্ষ-কোটি রূহ বিচরণ করছে। এদের মধ্যে একটি রূহ অতি আলোকময় ও সুঘ্রাণযুক্ত। আর তা ছিল হযরত আবূ বকর (রাযি.) এর রূহ। তখন আমি তাকে লক্ষ্য করে বললামঃ হে আবূ বকর! আমরা যেমন মাটির তৈরি মানুষ আপনিও তো তেমন মাটির তৈরি মানুষ, আমাদের মাঝে এত জ্যোতি ও ঘ্রাণ নেই। আপনার মাঝে তা কোত্থেকে এল? তিনি উত্তরে বললেনঃ তুমি ঠিকই বলছো। কিন্তু আমি কিছুদিন একটি ফুলের সংশ্রবে ছিলাম যার কারণে আমার মধ্যে ঐ ফুলের ঘ্রাণ বিরাজ করছে। ঐ ফুলের সোহবত ও সংশ্রবের বরকতে আমার মধ্যে এ ঘ্রাণ উপলব্ধি করছো, না হয় আমিও তোমাদের ন্যায় মাটির ঢিলা, আমার থেকেও মাটির গন্ধই বের হতো।

কে সে ফুল? সে ফুল হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। কেমন ঘ্রাণযুক্ত সেই ফুল? তিনি কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেখান দিয়ে কেউ গেলে বুঝতে পারতো যে, কে এ রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছেন। আকাশ-বাতাস বলে দিত যে, এ রাস্তা দিয়ে শাহে দো আলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হেঁটে গেছেন। এখনও তাঁর ঘ্রাণ আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ও চতুর্দিক সুরভিত করছে।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. এর মদীনায় সুঘ্রাণ পাওয়া

আমার দাদা উস্তাদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. [১৩১০-১৩৯৪ হি.] যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গেলেন। মদীনার

গলিতে হাঁটার সময় সুঘ্রাণ পাচ্ছিলেন। এমন সুন্দর ও মিষ্টি ঘ্রাণ আর কোন দিন পাননি। এমন সুন্দর ঘ্রাণ কোন ফুলের, ফুলটি কেমন, বাগানটি কোথায়? তা দেখার জন্য বিভিন্ন গলিতে হাঁটতে থাকেন। কিন্তু কোন ফুল বাগান দেখতে পান না। ভাবলেন গলি ভুল হয়ে গেছে। তাই গলি পরিবর্তন করে আরেক গলিতে হাঁটেন। কিন্তু ঘ্রাণ পাওয়া যায়, বাগান পাওয়া যায় না। এভাবে গলি পরিবর্তন করতে থাকেন, কিন্তু কোন বাগান নজরে পড়ছে না। কিছুক্ষণ ঘুরার পর আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে অন্তরে ইলহাম হলো, ও যফর আহমাদ! কোন্ ফুল বাগান দেখার জন্য ঘুরছ? এখনো কি তোমার বুঝে আসেনি, তুমি কোন্ ফুলের ঘ্রাণ পাচ্ছো? ঐ ফুল তো মদীনার রওযা পাকের মধ্যে আরাম করছেন।

خوشبو سے تری اب بھی مدینہ ہے معطر
مکے کا ہر کوچہ بھی پتھر بھی شجر بھی

আপনার ঘ্রাণে এখনো মদীনা ও মক্কার
প্রত্যেকটি গাছ ও পাথর পর্যন্ত সুরভিত।

নাক ঠিক থাকলে, নবীর মহব্বতওয়ালা অন্তর ও নাক নিয়ে যেতে পারলে গিয়ে দেখুন না, এখনো সে ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।

আবূ বকর (রাযি.) বলেনঃ সেই ঘ্রাণযুক্ত ফুলের সংশ্রবে থাকার কারণে আমার মধ্যে এই ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। আন্দাযা করুন! তাঁর মর্যাদা কত উর্ধ্বে! যদি কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের আমল এক পাল্লায় রাখা হয় আর হযরত আবূ বকর (রাযি.) যিনি তিন রাত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করেছিলেন ঐ তিন রাতের আমল এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে হযরত আবূ বকর (রাযি.) এর ঐ তিন রাতের আমলের পাল্লাই ভারী হবে। এই মহামানবকে কথিত বুদ্ধিজীবী 'বলদের বাপ' বলেছেন। নাউযুবিল্লাহ! আসলে এমন উদ্ভট কথা বলে তিনি নিজের আসল পরিচয় তুলে ধরছেন মাত্র!

آنکس کہ نداند وبداند کہ بداند

در جہل مرکب ابدالدہر بماند

যে জানে না অথচ মনে করে যে, সে জানে এমন ব্যক্তি
আজীবন ডবল মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে।

বুদ্ধিমান কে?

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বলছি। ঘটনাটি বাস্তব নাও হতে পারে, মাফ করবেন। তবে আমার বিষয়বস্তু বুঝার জন্য অনেক সহায়ক হবে তাই বলছি। ঘটনাটি হলোঃ

এক বুদ্ধিজীবী ছুটিতে বাড়ী এসে দেখেন তার ছেলের মাথায় টুপি ও পরনে জুব্বা। ছেলের এই পোশাক দেখে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে জানতে চাইলেন যে, ছেলের পরনে এ ধরনের পোশাক কোত্থেকে এলো? স্ত্রী উত্তর দিল যে, ছেলেকে নূরানী মাদরাসায় ভর্তি করেছি। এ কথা শুনে বুদ্ধিজীবী রাগান্বিত হয়ে যান। স্ত্রী যুক্তি দিল যে, আমি যাচাই করেছি, অন্য প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছর লেখা-পড়া করলে যা কিছু শিখতে পারে, নূরানীতে তিন বছর লেখা-পড়া করলে এর থেকে আরো অনেক বেশি শিখতে পারে। তাই নূরানীতে ভর্তি করেছি। নূরানী শেষ করলে আপনি আপনার পথে নিয়ে যাবেন। কোন সমস্যা হবে না। স্ত্রীর যুক্তি শুনে বুদ্ধিজীবী আপাতত মেনে নিলেন।

যেহেতু ছুটিতে বাড়ী এসেছেন। বুদ্ধিজীবী তার স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে শশুর বাড়ী বেড়াতে রওনা হন। পথের মধ্যে এক চকলেট ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাত ঘটে। ছেলের অনুরোধে বুদ্ধিজীবী এক টাকা দিয়ে ছেলেকে একটি চকলেট কিনে দিলেন। ছেলে চকলেট চুসতে চুসতে পিতার সাথে নানার বাড়ীর দিকে চলছে। এভাবে অর্ধেক চকলেট খাওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ ছেলের মুখ থেকে চকলেটটি মাটিতে পড়ে যায়। ছেলে তাড়াতাড়ি চকলেটটি তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে পুনরায় মুখে দিয়ে দেয়। এ অবস্থা

দেখে বুদ্ধিজীবী খুব ক্ষুব্ধ হয়ে ছেলেকে বললঃ ছিঃ! ছিঃ! বেটা তুমি কী করছ? অর্ধেক চকলেটতো খাওয়া হয়েই গেছে আর মাত্র আট আনার চকলেট বাকি আছে, এর লোভ তুমি সামলাতে পারলে না। তুমি আমার ইজ্জত শেষ করলে। ছেলে উত্তর দেয়ঃ আব্বু! মাদরাসার বড় হুযূরের কাছে শুনেছি; কোন খাবার মাটিতে পড়ে গেলে তা পুনারায় তুলে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়া নবীর সুন্নাত। -اَللّٰهُ اَكْبَرُ- বুদ্ধিজীবী সুন্নাতের মর্ম ও তাৎপর্য কী বুঝবে? সুন্নাতের মর্যাদা বুঝতে হলে তো নবীর ভালবাসা লাগে।

একটি সুন্নাতের আশ্চর্য তাৎপর্য

আমার মেজ ভাই জনাব ডাক্তার আবূ ইউসূফ সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি; ইউরোপের এক খৃষ্টান ডাক্তার মুসলমানদের হাঁচি নিয়ে গবেষণা করছিলেন যে, মুসলমানরা হাঁচির পর “আলহামদু লিল্লাহ” পড়ে কেন? সাধারণত কোন সুসংবাদ পেলে মুসলমানরা আলহামদু লিল্লাহ পড়ে। হাঁচিতে কিসের সুসংবাদ? অনেক গবেষণার পর তথ্য উদঘাটন হল যে, একটি হাঁচির সাথে তিন হাজার রোগ-জীবাণু বেরিয়ে যায় আর মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় একসাথে দু'টি হাঁচি দেয়। এভাবে দু'টি হাঁচির সাথে ছয় হাজার রোগ জীবাণু বেরিয়ে যায়। তিনি ভাবলেন এ তথ্য বের করতে আমার অন্তত বিশ বছর লেখা-পড়া করতে হয়েছে। আরো কত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু যে যুগে মুসলমানদের নবী এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন সে যুগেতো এত মেশিন ছিল না আর তিনিতো দুনিয়ার কারোর কাছে লেখা-পড়াও শিখেননি। তিনি এগুলো জানলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী। আল্লাহ পাক তাঁকে জানিয়েছেন বিধায় তিনি তাঁর উম্মতদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, হাচির পর “আলহামদু লিল্লাহ” পড়বে। অতএব তিনি সত্য নবী। ফলশ্রুতিতে ঐ খৃষ্টান ডাক্তার একা নয় বরং স্বপরিবারে মুসলমান হয়ে গেছেন।

বুদ্ধিজীবীর ঘটনার বাকী অংশ

বুদ্ধিজীবী বলছেনঃ রাখো তোমার বড় হুযুরের কথা। আজ যদি আমার কোন সহকর্মী এখানে থাকত লজ্জায় আমার নাক কাটা যেত। বেটা! মনে রাখবে, এভাবে কোন কিছু পড়ে গেলে তা আর উঠাতে হয় না। মনে করতে হয়, যে বস্তুটি পড়ে গেছে তা পঁচা ও ব্যবহারের অযোগ্য তা আর ব্যবহার করা যাবে না। তোমার কতটি চকলেট লাগবে আমি বাজার থেকে কিনে দেব। এভাবে ছেলেকে বুঝায়ে চলতে চলতে বুদ্ধিজীবী সাহেব শশুর বাড়ীর নিকটে গিয়ে পৌঁছান।

শশুর বাড়ীর পাশে ছিল একটি খাল, খালের ওপাড়েই শশুর বাড়ী। খাল পাড়ি দিতে গিয়ে আল্লাহ পাকের মর্জি, হঠাৎ বুদ্ধিজীবীর স্ত্রীর পা পিছলে সে কাদায় পড়ে যায়। বুদ্ধিজীবী তাড়াতাড়ি করে গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেন কাদা থেকে উঠানোর জন্য। এ অবস্থা দেখে ছোট ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বলছেঃ আব্বু! ছিঃ! ছিঃ! আপনি কী করছেন? বুদ্ধিজীবী বলছেনঃ কেন আব্বু তোমার আম্মুকে উঠাচ্ছি। ছেলে বললঃ আপনি নিজের ওয়ায ভুলে গেছেন? একটু আগেইতো আমাকে ওয়ায করলেন যে, কোন কিছু পড়ে গেলে বুঝতে হবে যে, ঐ বস্তুটি পঁচা, ব্যবহারের অযোগ্য, তা আর উঠানো যাবে না। এখন যে, আপনি পঁচা ও ব্যবহারের অযোগ্য স্ত্রীকে নিয়ে টানাটানি করছেন উঠানোর জন্য? আব্বু এ পঁচা স্ত্রী এখানেই থাকুক। আপনার কত স্ত্রী লাগবে আমি বাজার থেকে কিনে দেব। বুদ্ধিজীবী বলছেনঃ বেটা! দেখ না? ঐ যে তোমার মামারা বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে। ছেলে বলছেঃ ওরা তাকিয়ে থাকলে কি হবে? বুদ্ধিজীবী বলছেনঃ ওদের বোনকে এখানে কাদায় ফেলে রেখে ওদের বাড়ীতে উঠলে ওরা আমার পিঠের চামড়া রাখবে না?

ছেলে বলছেঃ আব্বু! আপনার স্ত্রীর সাথে আমার মামাদের সম্পর্ক হলো মাত্র ভাই-বোনের সম্পর্ক। এটুকু সম্পর্কের কারণে যদি তাদের বোনকে কাদায় ফেলে রেখে তাদের বাড়ী উপস্থিত হলে তারা আপনার পিঠের চামড়া তুলে নেবে এ ভয় হয়। তাহলে ভাবুন! আমার মুখ থেকে

যে চকলেটটি পড়ে গিয়েছিল সে চকলেটের সাথে আমার আল্লাহর সম্পর্ক, ভাই-বোনের নয় বরং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক। ভাই-বোনের সম্পর্কের তুলনায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক অনেক গভীর। এ চকলেটটি তৈরি করতে যা কিছুর প্রয়োজন হয়েছিল সবই আমার আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর দেয়া নিআমত। তিনিতো দেখছেন যে, চকলেটটি মাটিতে পড়ে গিয়েছে। যেহেতু তিনি "سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ" সবকিছু শোনেন ও দেখেন। অতএব, ঐ চকলেটটি মাটিতে ফেলে রেখে চলে গেলে, হাশরের মাঠে তাঁর সামনে উপস্থিত হলে শুধু পিঠের চামড়া নয়, তিনি মেরুদণ্ডের হাড় পর্যন্ত গুঁড়ো করে ফেলবেন।

বুদ্ধিজীবী বলছেনঃ বেটা! আজ তোমার গায়ে কুরআন ও মাদরাসার ছোঁয়া লাগার দরুণ তোমার মত একজন ছোট্ট ছেলের সামনে আমার মত একজন বুদ্ধিজীবী হার মানতে বাধ্য হল। বেটা! তোমার কথা মেনে নিলাম। তুমি তোমার বড় হুযূরের কথা তথা সুন্নাতের উপর আমল করবে। আমিও আমার স্ত্রীকে উঠিয়ে নিয়ে ব্যবহার করব। এবার চিন্তা করুন,

বাস্তবে বুদ্ধিমান কে এবং বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে পার্থক্য কী?

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ

অর্থ ঃ বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি এক সমান?[30]

তালিবে ইলমদের ধারা উর্ধ্বমূখী

দেখুন, বাচ্চারা ا ب ت ث ও কুরআন শরীফ বা হাদীস শরীফ পড়ছে, তারা তাদের উস্তাদদের থেকেই তো এ ইলম অর্জন করেছে। তারা তাদের উস্তাদদের থেকে শিখেছেন। এভাবে এই শিক্ষার ধারা চলতে চলতে তাবয়ে তাবেঈন পর্যন্ত পৌঁছাবে। আর তাঁরা শিখেছেন তাবেঈন এর নিকট থেকে, তাঁরা শিখেছেন হযরাতে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে। আর

---

[30] সূরা আয্-যুমার, ৩৯ ঃ ৯

তাঁরা শিখেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে, তিনি শিখেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে। এভাবে এ শিক্ষার ধারা উপরে চলতে চলতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এ বিশ্বে পড়া-লেখার আরো একটি ধারা আছে, যার সর্বোচ্চ ডিগ্রির নাম "ডক্টরেট ডিগ্রি"। আগে এ ডিগ্রি ছিল না। তাহলে বলুন, সর্ব প্রথম যে এই ডিগ্রি লাভ করেছে, সে কার কাছ থেকে এ ডিগ্রি নিয়েছে? এর আগে তো কোন ডক্টর ছিল না? বেশির থেকে বেশি একজন এম. ফিল এর কাছ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছে। এম. ফিল ওয়ালা কার কাছে পড়েছে? একজন মাস্টার্সের কাছে, তাকে কে পড়িয়েছে? একজন ডিগ্রিওয়ালা, তাকে একজন ইন্টারওয়ালা, তাকে মেট্রিক ওয়ালা, মেট্রিক ওয়ালাকে নাইনওয়ালা, নাইনওয়ালাকে এইটওয়ালা, এইটওয়ালাকে সেভেনওয়ালা, সেভেনওয়ালাকে সিক্সওয়ালা, সিক্সওয়ালাকে ফাইভওয়ালা, ফাইভওয়ালাকে ফোরওয়ালা, ফোরওয়ালাকে থ্রীওয়ালা, থ্রীওয়ালাকে টুওয়ালা, টুওয়ালাকে ওয়ানওয়ালা। এবার বলুনঃ সর্ব প্রথম যে ক্লাশ ওয়ান পাশ করেছে তাকে কে পড়িয়েছে? যার ক্লাশ ওয়ানেরও সার্টিফিকেট ছিল না সে। এভাবে নামতে নামতে এ ধারা জিরো পর্যন্ত নামল। অর্থাৎ এ ধারার সর্বশেষ মাথায় হলো শূন্য। এ হলো দু'ধারার পার্থক্য।

کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

শকুনের জগত আর বাজ পাখির জগত এক নয়।

তালিবে ইলমের মর্যাদা

তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

من جائه الموت وهو يطلب العلم، ليُحيِيَ به الإسلامَ، فبينه وبين النَّبيين درجةٌ واحدةٌ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইসলামকে জিন্দা রাখার জন্য ইলম অন্বেষণে বের হয় এবং সে এ অবস্থায় মারা যায় (শেষ করতে পারেনি, আধা পথেই মারা গেছে) তার মধ্যে যদি একটি শর্ত পাওয়া যায় যে, সে ইলম অন্বেষণ

করছে একমাত্র ইসলামকে জিন্দা রাখার জন্য, টাকা-পয়সার জন্য নয়, এমন তালিবে ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তার মাঝে আর নবীদের মাঝে মাত্র একটি পার্থক্য বাকি থাকবে।[31]

আখেরাতে তারা বেহেশতে থাকবে। তবে বেশ-কম থাকবে মর্যাদার। যেমনঃ একটি সূতার মধ্যে তাসবীহের দানা গেঁথে এক মাথায় গিট্টু দিয়ে অপর মাথা ধরে টান দিলে সব দানা এক দিকে যাবে। গিট্টু না থাকলে সব পড়ে যাবে। এমনিভাবে যারা ইলমে দ্বীন শেখার সূতার মধ্যে ঢুকল, এক মাথায় তারা আর অন্য মাথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। যদি মাথায় শক্ত গিট্টু থাকে (এখানে গিট্টু মানে ইখলাছ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের পাবন্দী এবং পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ) তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেদিকে যাবেন পুরো লাইনের সকলেই সে দিকে যাবে। আর যদি মাথায় গিট্টু না থাকে তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিকে যাবেন আর বাকীরা পড়ে যাবে। তাঁর সাথে যেতে পারবে না।

শিক্ষা কাকে বলে? শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, এ কথা বলতে কি বুঝায়? আশা করি বুঝতে পেরেছেন কোন্ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের শিক্ষাই বাস্তব শিক্ষা এবং একমাত্র এ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যারা এ শিক্ষার দাম বুঝেছেন তারা এর জন্য অজস্র ত্যাগ ও কোরবানী পেশ করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামসহ যুগে যুগে এমন ত্যাগের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে ভরপুর। এর একটি ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

কুরআনী শিক্ষার জন্য সাহাবায়ে কিরামের কুরবানী

বদরের রনাঙ্গণে হযরত আসেম বিন সাবেত (রাযি.) এর হাতে সালাফা নামী এক কাফের মহিলার দুই ছেলে মারা যায়। সংবাদ পেয়ে

---

[31] সুনানু দারেমী, খ. ১, পৃ. ১১২, হাদীস নং ৩৫৪, কাশফুল খাফা, খ. ২, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং ২৪৫০ (মা'সূম বিল্লাহ)

সালাফা শপথ নেয় যে, আমি আসেম বিন সাবেত-এর মাথার বাটি দিয়ে মদ পান করে ছাড়ব। সে তার শপথ পূরণের লক্ষ্যে ঘোষণা দেয় যে, "যে কেউ আসেমকে জীবিত অথবা তার মাথা আমার কাছে এনে দিতে পারবে আমি তাকে একশত উট পুরস্কার দিব।" এ ঘোষণা শুনে সুফিয়ান বিন খালেদের লালসা হল যে, পুরস্কারটি আমি গ্রহণ করব। অতএব, সে ধোকার পন্থা অবলম্বন করে আযল ও ক্বারা গোত্রের সাতজন ব্যক্তিকে বাহ্যিকভাবে মুসলমান সাজিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দেয় আর এভাবে বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় যে, তোমরা মদীনায় যেয়ে মুসলমানদের নবীকে বলবেঃ হুযূর! আমরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছি কিন্তু আমাদেরকে কুরআন শেখানোর মত কোন ক্বারী নেই। আপনি আমাদেরকে কিছু ক্বারী দিন আমরা তাদের কাছে কুরআন শিখব।[32] ঘটনাটি ৪র্থ হিজরীর সফর মাসের।

ক্বারীর কথা এ জন্য বলেছে, যাতে আসেমকে সহজেই নিয়ে যেতে পারে। কেননা তিনি একজন প্রসিদ্ধ ক্বারী ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাজী হলেন না, কিন্তু এদের কাকুতি-মিনতি দেখে শেষমেশ তাদের সাথে দশজন ক্বারী দিয়ে দেন এবং হযরত আসেমকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দেন। তারা এ দশজন সাহাবিয়ে রাসূল ও কুরআনের ক্বারীকে নিয়ে মদীনা থেকে রওনা হয়ে মক্কা মুকার্‌রমার নিকটে গিয়ে পৌঁছে।

মদীনা শরীফ থেকে মক্কা মুকার্‌রমার দূরত্ব প্রায় ৫০০ কি. মি.। কুরআন শিখানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের এ সফর। তখন কোন গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল না। পাহাড়ী রাস্তা, পানির ব্যবস্থা নেই, ছায়ার ব্যবস্থা নেই, প্রচণ্ড গরম, প্রায় সময় লু-হাওয়া চলে। এভাবে ৫০০ কি. মি. রাস্তা অতিক্রম

---

[32] সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫৮৫ এ ঘটনাটি উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয়ার কথাটি উল্লেখ নেই। তবে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। "তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহতেও" কুরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়ার কথাটি উল্লেখ আছে। (মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন)

করা সাধারণ কথা নয়। শুধুমাত্র কুরআনের মহব্বতে এ শ্রম ও কুরবানী পেশ করেছেন।

از محبت تلخہا شیریں شود

وز محبت رنجہا راحت بود

মহব্বতের দরুন তিক্ত বস্তুও মিঠা হয়ে যায়,
তেমনিভাবে মহব্বতের কারণে কষ্টও আরামে পরিণত হয়ে যায়।

তাঁরা যখন আছফান (একটি জায়গার নাম) ও মক্কা মুকার্‌রমার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেন তখন ঐ সাত ব্যক্তি হতে একজন সামনে এগিয়ে গিয়ে সুফিয়ান বিন খালেদকে সংবাদ দেয়। খালেদ সংবাদ পেয়ে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত ২০০ লোক নিয়ে উপস্থিত হয়। হযরত আসেম এদেরকে দেখে ব্যাপারটি বুঝে ফেলেন এবং তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে 'ফদফদ' নামক একটি টিলায় উঠে যান। অতঃপর সাথীদেরকে সামনে রেখে একটি ভাষণ দেন, যার সারসংক্ষেপ এইঃ

غازی ہیں ہمیں گر ہو فتح ورنہ شہادت

آئندہ ملے ورنہ ملے سمجھو غنیمت

"আজকের এ সংকটময় সময়ে যদি আমরা জয়ী হই তাহলে
আমরা হব গাজী। আর যদি মারা যাই তাহলে হব শহীদ।
আল্লাহ পাকের দরবারে গাজীর মূল্যও কম নয় আবার শহীদের
মর্যাদাও কম নয়। অতএব এ সময়কে গনীমত মনে করা চাই।
ভবিষ্যতে এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতে নাও আসতে পারে।"

এতে সকলে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

সুফিয়ান পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বলল, ও আসেম! কোথায় এসে কার সামনে এমন গরম বক্তব্য দিচ্ছ! দেখছনা! আমরা দু'শ' যোদ্ধা তোমাদেরকে বেষ্টনি দিয়ে আছি।

হযরত আসেম উত্তর দিলেনঃ

"তোমরা মদ পান করাকে যে পরিমাণ ভালবাস, আমরা মউতকে এর চেয়েও অধিক ভালবাসি। দু'শ' কাফের কেন, গোটা বিশ্বের তাগুতী শক্তিও যদি এক হয়ে আমি আসেম এর বিরুদ্ধে ময়দানে আসো, আর আমি একা থাকি ও আল্লাহ পাকের রহমত আমার সাথে থাকে আমি ভয় পাওয়ার মত নই।"

ڈر نہیں کچھ غم نہیں جب رحمت رحمن ہے
جملہ عالم ہو مخالف پھر نہیں نقصان ہے

আল্লাহ পাকের রহমত সাথে থাকলে কিসের ভয়?
গোটা বিশ্বও যদি আমার বিরুদ্ধে যায় তাতেও কোন ক্ষতি নেই

কাফেররা বললঃ আসেম! তাড়াহুড়া করোনা, জীবন হারিয়োনা, আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।

হযরত আসেম উত্তর দিলেনঃ

"আমরা কোন মুশরিকের নিরাপত্তা চাইনা, দ্বীনের জন্য জীবন দেয়াইতো আমাদের কাজ। আমি শুনেছি, সালাফা শপথ করেছে, সে আমার মাথার বাটি দিয়ে মদ পান করবে। তোমরা এ উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছ।"

অতঃপর আল্লাহ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ (মনোনিবেশ) হয়ে বললেনঃ

"ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের এ অবস্থার কথা আপনার নবীকে জানিয়ে দিন।"

আল্লাহ পাক তাঁর এ দু'আ কবূল করে নিলেন এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সব কিছু জানিয়ে দিলেন। এর মধ্যেই কাফেররা তাঁদেরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে দেয়, মুসলমানগণও এর জবাব তীর দিয়ে দিতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তীর

শেষ হয়ে যায়, বর্শার যুদ্ধ শুরু হয়, বর্শা ভেঙ্গে গেলে তলোয়ারের তুমুল লড়াই আরম্ভ হয়। এর মধ্যে হযরত আসেমকে এক কমবখত কাফের জোরে একটি বর্শা মারে, আর বর্শাটি তার এক দিক থেকে ঢুকে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এতে তিনি শহীদ হয়ে যান।
এ সময়ে তিনি দু'আ করেছিলেন যে,

> "হে আল্লাহ! আমি তোমার দ্বীনের জন্য, অর্থাৎ কুরআন শিক্ষা দিতে এসে জান উৎসর্গ করলাম। আমি শুনেছি সালাফা শপথ করেছে, সে আমার মাথার বাটি দিয়ে মদ পান করবে, তুমি আমার শরীরকে কাফিরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে। আমার মৃত দেহটি তোমার হাতে আমানত রেখে গেলাম।"

হযরত আসেম (রাযি.) এর দেহ হিফাযতের জন্য মৌমাছির লস্কর

যুদ্ধ শেষে কাফেররা হযরত আসেম (রাযি.) এর মাথা নেয়ার জন্য তলোয়ার নিয়ে তার লাশের কাছে এসে দেখে মৌমাছির লস্কর তার চতুর্দিকে বেষ্টনি দিয়ে আছে। তারা তাঁর কাছেই ভিড়তে পারছে না। কাছে গেলেই মৌমাছি কামড় দেয়। আল্লাহ পাক তাঁর হিফাযতের জন্য মৌমাছির লস্কর পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা পরামর্শ করল যে, চল! আমরা এখন ফিরে যাই। রাতে এসে তার কল্লা কেটে নিয়ে যাব। কারণ রাতে মৌমাছি বাইরে থাকে না, বাসায় চলে যায়। কিন্তু রাতে এসে দেখে; কোত্থেকে বন্যা এসে তাঁর লাশ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে কাফিররা তাঁর মাথা মোবারক কেটে নিতে ব্যর্থ হয়।

অতঃপর যখন সুফিয়ান সালাফার নিকট লোক পাঠিয়ে একশত উট দাবী করে। সালাফা তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে ফিরিয়ে দেয় যে, আমার শর্ত ছিল, আসেমের মাথা বা তাঁকে জীবিত নিয়ে আসা, এ দু'টির কোন শর্ত তোমরা পূরণ করতে পারনি। কাজেই আমি তোমাদেরকে উট দিব না।

وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ- (হে আল্লাহ!) তুমি যাকে ইচ্ছা কর তাকে সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর, কল্যাণ-সফলতা কেবল তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে শক্তিমান।[33]

তিনি হযরত আসেম (রাযি.) কে মৌমাছির লস্কর দিয়ে হিফাযত করে, দিলেন ইজ্জত ও সম্মান। আর সুফিয়ানকে সালাফার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে, করলেন বেইজ্জত ও লাঞ্ছিত।

হযরত আসেম (রাযি.) এর অন্যান্য সাথীদের অবস্থা

হযরত আসেমের সাথে আরো ৬ জন সাহাবী শহীদ হয়ে যান। বাকী তিনজন বন্দী হন, তাঁরা হলেনঃ হযরত খুবাইব বিন আদী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ বিন তারেক (রাযি.) এবং হযরত যায়েদ বিন দাসিনাহ (রাযি.)। বন্দী করে তাঁদের হাত বেঁধে মক্কা শরীফের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) কোন রকম হাত খুলে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কাফিরগণ চতুর্দিক থেকে পাথর মেরে তাঁকেও শহীদ করে ফেলে। বাকী দু'জনকে মক্কা শরীফ নিয়ে যায়। হযরত খুবাইব বিন আদী (রাযি.) কে হারিস বিন আমির বিন নওফেল এর পুত্রগণ তাদের পিতৃ-প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একশত উটের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়। কারণ, হারিস হযরত খুবাইবের হাতে বদরের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, তার বদলে হযরত খুবাইবকে শূলে দিবে। আর হযরত যায়েদকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ৫০টি উটের বিনিময়ে খরিদ করে নেয়। কেননা তার পিতা উতবা হযরত যায়েদ এর হাতে বদরের যুদ্ধে মারা যায়। এ দু'জন যীকা'দাহ মাসে মক্কায় পৌঁছেন বিধায় তাদেরকে সাথে সাথে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। কেননা আরবী বছরে চারটি মাসকে "আশহুরে হুরুম" বলা হয়। এ চার মাসে কাউকে হত্যা করা নিষেধ। আর যীকা'দাহ ঐ চার মাসের একটি। তাই হারাম মাস অতিবাহিত হওয়ার অপেক্ষায় তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়।

---

[33] সূরা আল-বাকারা, ২ ঃ ২৬

হযরত খুবাইব (রাযি.) এর জন্য গায়েবী আঙ্গুর

হারিসের স্ত্রী বলেনঃ (তিনি পরবর্তিতে মুসলমান হয়েছিলেন) খুবাইব আমাদের কাছে বন্দী ছিল, জেলখানার গেট তালাবদ্ধ ছিল। খুবাইবের হাত-পা ছিল শিকলে বাঁধা। এমতাবস্থায় আমি তাকে একদিন আঙ্গুর খেতে দেখেছি; অথচ তখন মক্কায় কোন ফল ছিল না। এ আঙ্গুর ছিল আল্লাহ পাকের দেওয়া অদৃশ্য ভাণ্ডারের রিযিক। হযরত খুবাইবের জন্য আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছিলেন।

নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ঢোল পেটানো হলো যে, অমুক দিন অমুক সময় খুবাইব ও যায়েদকে শূলে দেয়া হবে। যারা দেখতে ইচ্ছুক তারা নির্দিষ্ট সময়ে স্থানে উপস্থিত থাকবে। ঐ তারিখে হারামের বাইরে তানঈম নামক স্থানে হযরত খুবাইব ও হযরত যায়েদকে শূলে চড়ানো হয়।

হাজীগণ হজ্ব করতে গিয়ে উমরা করার জন্য মসজিদে আয়েশায় গিয়ে ইহরাম বাঁধেন ঐ জায়গার নাম 'মাওযায়ে তানঈম'। মসজিদের বাম দিকে, উযূখানার সামনে দু'টি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, ঐ স্তম্ভ দু'টি দু'জন কুরআনের ক্বারীর শাহাদাতের স্মৃতি বহন করে আছে। অন্তর্চক্ষু থাকলে দেখা যাবে, এখনও যেন ওখানে শহীদের তাজা রক্ত প্রবাহমান আছে। এর প্রাক্কালে হযরত খুবাইব (রাযি.) দু'রাকাত নামায পড়ার জন্য সময় চাইলে তারা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে। হযরত খুবাইব (রাযি.) সংক্ষেপে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। এভাবে তিনি নিষ্পাপ মৃত্যুর পথযাত্রীদের জন্য দু'রাকাত নামাযের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। সেদিন থেকে ফাঁসির পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়া সুন্নাতে খুবাইবী।

بنا کردند خوش رسمے بخاک وخون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

মাটি ও রক্তে সংমিশ্রিত হয়েও যারা
এই সুন্দর আদর্শ ও রীতি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন

এ ধরণের পূর্ত প্রেমিকদের উপর আল্লাহ্ পাক
অশেষ রহমত নাযিল করুন।

দু'রাকাত নামায পড়ার পর তিনি বললেনঃ হে লোক সকল! এ নামায আমার জীবনের শেষ নামায, আর নামায পড়া আমার ভাগ্যে জুটবে না, মন চেয়েছিল যে নামাযটি লম্বা করি, দীর্ঘ কিরাআত, দীর্ঘ রুকু ও সিজদার মাধ্যমে নামাযটি আদায় করি। কিন্তু যদি আমি নামায দীর্ঘায়িত করি তাহলে তোমরা বলবে যে, খুবাইব নামাযের বাহানা দিয়ে আরও কিছু সময় বেঁচে থাকতে চায়। তোমাদের ধিক্কারের আশংকায় নামায সংক্ষেপ করলাম। এবার তোমাদের যা মনে চায় তাই করতে পারো। অতঃপর ভক্তিময় ও আবেগ কণ্ঠে নিম্নবর্ণিত কবিতাটি পাঠ করলেনঃ

ولستُ أُبالِيْ حين أُقتَلُ مسلماً

على أيِّ شقٍّ كان لله مَصرعى

وذلك في ذات الإله وإنْ يَّشاء

يُبارِكْ على أوصالِ شلوٍ ممزَّع

আমার কোন ভাবনা ও পরওয়া নেই
যখন আমি মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণ করছি,
কেননা এ প্রাণ উৎসর্গ যেভাবেই সংগঠিত হোক না কেন
তা তো আল্লাহ্ পাকের জন্যই হচ্ছে।
আমার এ আত্মনিবেদন যেহেতু আল্লাহ্ পাকের জন্যই হচ্ছে,
তাই তিনি চাইলে প্রতিটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে
বরকত দিতে পারেন এবং কল্যাণের ফায়সালা করতে পারেন।[34]

[34] সহীহ্ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫৮৫

হযরত খুবাইব (রাযি.) শূলে

আহ! অতঃপর হযরত খুবাইব (রাযি.) কে শূলে চড়ানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো। তাঁর চেহারা কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। খুবাইব (রাযি.) বললেনঃ "এতে কিছু আসে যায় না। তোমরা আমার চেহারা যেদিকেই ফিরাওনা কেন সেদিকেইতো আমার আল্লাহ বিদ্যমান"।

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

অর্থ- পূর্ব পশ্চিম সবই আল্লাহর, অতএব যেদিকেই ফিরো সেদিকেই আল্লাহ বিদ্যমান।[35]

তারা হযরত খুবাইব (রাযি.) কে বললোঃ এখনও সুযোগ আছে, তুমি যদি ইসলাম ত্যাগ করো তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তিনি বললেনঃ

> "তোমরা যদি সমস্ত পৃথিবীকেও আমার সামনে এনে দাও তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করব না। এক জীবনতো কিছুই নয়, শত সহস্র জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছি"।

তারা বললোঃ তুমি যদি একটি শর্ত মেনে নাও তাহলেও তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর তা হলো তোমার পরিবর্তে তোমার নবীকে শূলে চড়ানো হবে। এই শর্তটি তুমি মেনে নিলে নিজ গৃহে গমন করতে পারবে। হযরত খুবাইব (রাযি.) বললেনঃ

> "কখনও নয়, আমার নবীর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হবে আর এর বিনিময়ে আমি নিরাপদে ঘরে বসে থাকব এ কথাও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়"।

তারা যখন দেখলো তিনি কিছুই মানবেন না তখন তাঁকে শূলে চড়ানো হল এবং বদরে নিহত কাফিরদের আত্মীয়-স্বজনহারাদের মধ্য হতে চল্লিশজন লোক চতুর্দিক থেকে হযরত খুবাইব (রাযি.) এর দিকে

---

35 সূরা আল-বাকারা, ২ ঃ ১১৫

তীর বর্ষণ শুরু করে। এ সময়ে আল্লাহ পাকের রহমতে তাঁর চেহারা কেবলামুখী হয়ে যায়। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেনঃ

> "আল্লাহর শোকর, যিনি আমার মুখমন্ডল কেবলার দিকে ফিরায়ে দিলেন যা তিনি স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের জন্য পছন্দ করেছেন।"

এ কথা শুনে এক কাফের দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়। এভাবে চার দিক থেকে তীর-বর্শা ও পাথরের আঘাত চলতে থাকে। আর দর্শকরা হাত তালি দিতে থাকে ও তামাশা করতে থাকে। এমন ত্যাগ ও কুরবানী কুরআনের জন্যই ছিল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সামনে হযরত খুবাইব (রাযি.) এর জীবন দেওয়ার আরযু-আকাংখা

হযরত খুবাইব (রাযি.) বললেনঃ

> "ইয়া আল্লাহ! যেদিন তোমার হাবীবের হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, ঐ দিন থেকে একটি আরযু অন্তরে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আর তা হলো এই যে, তোমার দ্বীনের জন্য তোমার হাবীবের সামনে আমার জীবন উৎসর্গ করবো।"

آرزو ہے یہ کہ نکلے جاں تمہارے سامنے

میں تمہارے سامنے ہوں تو ہمارے سامنے

ও হাবীব! আশা ছিল, আমার জীবন
উৎসর্গ হবে এ অবস্থায় যে,
আমি থাকবো তোমার সামনে
আর তুমি থাকবে আমার সামনে।

আমার এ আশাটুকু বুঝি আর পূরণ হলো না।

হযরত খুবাইব (রাযি.) এর অন্তিম সালাম

এ মুহূর্তে হযরত খুবাইব (রাযি.) আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেনঃ

"ইয়া আল্লাহ! যেদিকেই তাকাই শুধু দুশমনই নজরে আসে। এখানে এমন কেউ নেই, যে কেউ আমার সালাম তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছিয়ে দিবে, তুমি আমার অন্তিম সালাম তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছিয়ে দিও।"

হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রাযি.) বর্ণনা করেনঃ আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে একদল সাহাবীদের সাথে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় ওহী অবতরনের লক্ষণ দেখা গেল। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলে উঠলেনঃ "وعليك السلام يا خبيب" (ওয়া আলাইকাস সালামু ইয়া খুবাইবু)। অর্থঃ "হে খুবাইব! অসংখ্য-অগণিত সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক তোমার উপর।"

সাহাবায়ে কেরাম রা. আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! খুবাইবকে তো কুরআন শরীফ শেখানোর জন্য মক্কা মুকাররমায় পাঠিয়েছেন। সেতো এখানে নেই। তার সালামের জবাব দিচ্ছেন কি হিসেবে? আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ ও আমার সাহাবারা! তোমরা জানো না, কাফেররা আমার দশজন কলিজার টুকরা কুরআনের ক্বারীকে ধোকা দিয়ে নিয়ে শহীদ করে ফেলেছে, এদের একজনও আর জীবিত নেই। জিবরীল (আ.) এসে এই মাত্র খুবাইবের সালাম আমাকে পৌঁছিয়ে গেলেন তাই জবাব দিলাম। "وعليك السلام يا خبيب" (ওয়া আলাইকাস সালামু ইয়া খুবাইবু)।

হযরত যায়েদ (রাযি.) এর শাহাদাত

হযরত খুবাইব (রাযি.) এর মত হযরত যায়েদ (রাযি.) কেও শূলে চড়ানো হয়। তিনিও শূলে চড়ার পূর্বে দু'রাকাত নামায আদায় করেন।

হযরত খুবাইব (রাযি.) এর সাথে কাফিররা যে ধরনের কথা-বার্তা বলেছিল অনুরূপ হযরত যায়েদ (রাযি.) এর সাথেও বলেছে। তাঁর কাছ থেকেও তারা একই উত্তর পেয়েছে।

হযরত খুবাইব (রাযি.) এর দাফন

কাফিররা হযরত খুবাইব (রাযি.)কে বেইজ্জত করার লক্ষ্যে তাঁর লাশ শূলে ঝুলিয়ে রেখেছিল, দাফন করছিল না। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো, যে শূল হতে খুবাইবের লাশ নামিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করতে পারবে? হযরত যুবাইর (রাযি.) ও হযরত মিক্বদাদ (রাযি.) এ দায়িত্ব গ্রহণ করে তদুদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁরা দু'জন দিনের বেলায় পাহাড়ের গুহা ইত্যাদিতে লুকিয়ে থাকতেন, আর রাতের বেলায় পথ অতিক্রম করতেন। এভাবে চলতে চলতে চল্লিশ দিন পর 'মাওযায়ে তানঈম' নামক স্থানে পৌঁছেন। গিয়ে দেখেন লাশের আশে-পাশে চল্লিশজন লোক পাহারা দিচ্ছে। যেন কেউ লাশ নিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত, যে রাতে তারা 'মাওযায়ে তানঈম' এ পৌঁছেন ঐ রাতে সকল পাহাদারের চোখে ঘুম এসে যায়, তারা সকলেই ঘুমে বিভোর। এদিকে হযরত যুবাইর (রাযি.) ও হযরত মিক্বদাদ (রাযি.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা টিপে টিপে লাশের কাছে গিয়ে পৌঁছেন ও হযরত খুবাইব (রাযি.) কে শূল থেকে নামিয়ে আনেন।

সাহাবীদ্বয় রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন দীর্ঘ চল্লিশ দিন হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর লাশটি ছিল একবারেই তরুতাজা। মনে হচ্ছিল যে, তিনি এখন মাত্র শাহ্াদাত বরণ করেছেন। আর তখনও তার দেহ মোবারক থেকে টপ টপ করে তাজা রক্ত ঝরছিল। রক্তের প্রত্যেকটি ফোটা থেকে মেশক আম্বরের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল। সুবহানাল্লহ!!

পাহাদাররা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে শূলে খুবাইবের লাশ নেই, তখন সত্তরজন কোরাইশ উটের উপর সাওয়ার হয়ে মদীনার পথে রওয়ানা

করে। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখে মাত্র দু'জন মানুষ খুবাইবের লাশ নিয়ে যাচ্ছে। যখন তারা তাঁদের নিকটবর্তী হলো তখন হযরত যুবাইর (রাযি.) হযরত খুবাইব (রাযি.) এর লাশটি মাটিতে রেখে দিলেন। সাথে সাথে মাটি ফেটে দু'ভাগ হয়ে তাঁর লাশটিকে গিলে ফেলে ও তাঁর কবরের ব্যবস্থা করে দেয়। এ কারণেই হযরত খুবাইব (রাযি.) কে 'বালীউল আরদ্ব' (بليع الأرض) বলা হয়ে থাকে। যমীন যাকে গিলে কবরের ব্যবস্থা করে তাকে "বালীউল আরদ্ব" বলা হয়।

لئے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل

شہید ناز کی تربت کہاں ہے

বুলবুল মুখে ফুল নিয়ে ঘুরছে যে,
গৌরবময় শহীদের সমাধি কোথায়?

نظر مولی تیرے اس گھر کی نگہبانی کرے

فضل حق تیری لحد پر رحمت افشانی کرے

মাওলা পাকের দয়া তোমার এ ঘরের (কবরের)
রক্ষণাবেক্ষণ করুক। আল্লাহ পাকের মেহেরবানী
তোমার কবরে অহরহ রহমত বর্ষণ করুক।

অতঃপর হযরত যুবাইর (রাযি.) কাফিরদের লক্ষ্য করে বললেনঃ

"আমি যুবাইর ইবনুল আওয়াম। আমার মা ছুফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব। ইনি আমার সাথী মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ। আমাদের ভাই খুবাইবের লাশ উদ্ধারের জন্য এসেছি। তাতে আমরা সফলও হয়েছি, তোমরা তাঁকে আর বেইজ্জত করতে পারবে না। তোমাদের মন চাইলে আমাদের সাথে তীর দ্বারাও লড়তে পারো, মন চাইলে তরবারী দ্বারাও লড়তে পারো।"

এতে কাফিররা ভীত হয়ে ফিরে গেল। তাঁদের সাথে আর যুদ্ধ করল না।

ফেরেশতাদের মাঝে হযরত যুবাইর (রাযি.) ও হযরত মিক্বদাদ (রাযি.) এর আলোচনা

হযরত যুবাইর (রাযি.) ও হযরত মিক্বদাদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করলেন। ঐ সময় হযরত জিবরীল (আ.) তাশরীফ এনে বললেন যে, ফেরেশতাকুলের মাঝে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে উচ্চসিত প্রশংসা হচ্ছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁদের জন্য বেহেশতের দু'আ করলেন।

এ ছিল কুরআনের খিদমতের জন্য হযরত সাহাবায়ে কিরামের কুরবানী। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন ও কুরআনী শিক্ষার মূল্য কত বেশি। এভাবে দশজন নয়, হাজার হাজার সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজাহিদীনের রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের হাতে পৌঁছেছে এ মহাগ্রন্থ কুরআনে কারীম। তারপরও যদি আমরা এর মূল্যায়ন না করি তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে! আল্লাহ পাক আমাদেরকে কুরআনী শিক্ষা গ্রহণ করে তদানুযায়ী জীবন গড়ে তুলে উভয় জাহানে ধন্য হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

سبحانك اللّهمَّ وبحمدِك، أشهد أنْ لَّا إله إلَّا أنتَ، أَستغفرُك وأتوبُ إليك.

-: সমাপ্ত :-